সভ্যতার
ইতিহাস
ডক্টর অতুল চন্দ্র রায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত

BOARDS NOTIFICATION NO. S/412 DATED 27.12.83

সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

আধুনিক যুগ

[অষ্টম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যসূচীর অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক]

সংশোধিত নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে
সম্পূর্ণ নতুন ভাবে লিখিত।

অতুল চন্দ্র রায়, এম. এ., পি-এইচ ডি. (লণ্ডন)
স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডালিস্ট
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

● পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৭ ●

প্রান্তিক ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ : ট্রায়ো প্রসেস, কলিকাতা ৭০০০১৪

★ প্রকাশক ও মুখ্য বিপনণকারী "প্রান্তিক"
★ প্রথম প্রকাশকাল : ইং নভেম্বর, ১৯৮১
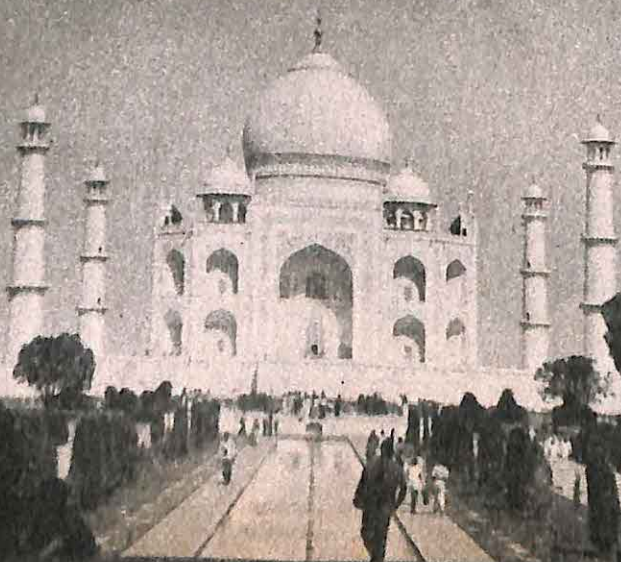
ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংশোধিত অষ্টম শ্রেণীরর পাঠ্যসূচী (Syllb/82/5 dated 21st September 1982) অনুসারে সভ্যতার ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ) গ্রন্থখানি রচিত হল। সংশোধিত দ্বাদশ অধ্যায়ের জন্য যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে এই বই-এ পালন করা হয়েছে। পাঠ্যসূচীতে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়বস্তু সুকুমার-মতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করেই লেখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠার নির্দেশ যথাসম্ভব পালন করা হয়েছে।

আশা করি বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসবে। গ্রন্থখানির উৎকর্ষের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করার আশ্বাস জানাই। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভ জগদ্ধাত্রী পূজা
৩১ শে অক্টোবর, ১৯৮৭

অতুল চন্দ্র রায়

মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন : ফতেপুর সিক্রীর বুলন্দ-দরওয়াজা

এক নজরে আধুনিক যুগ
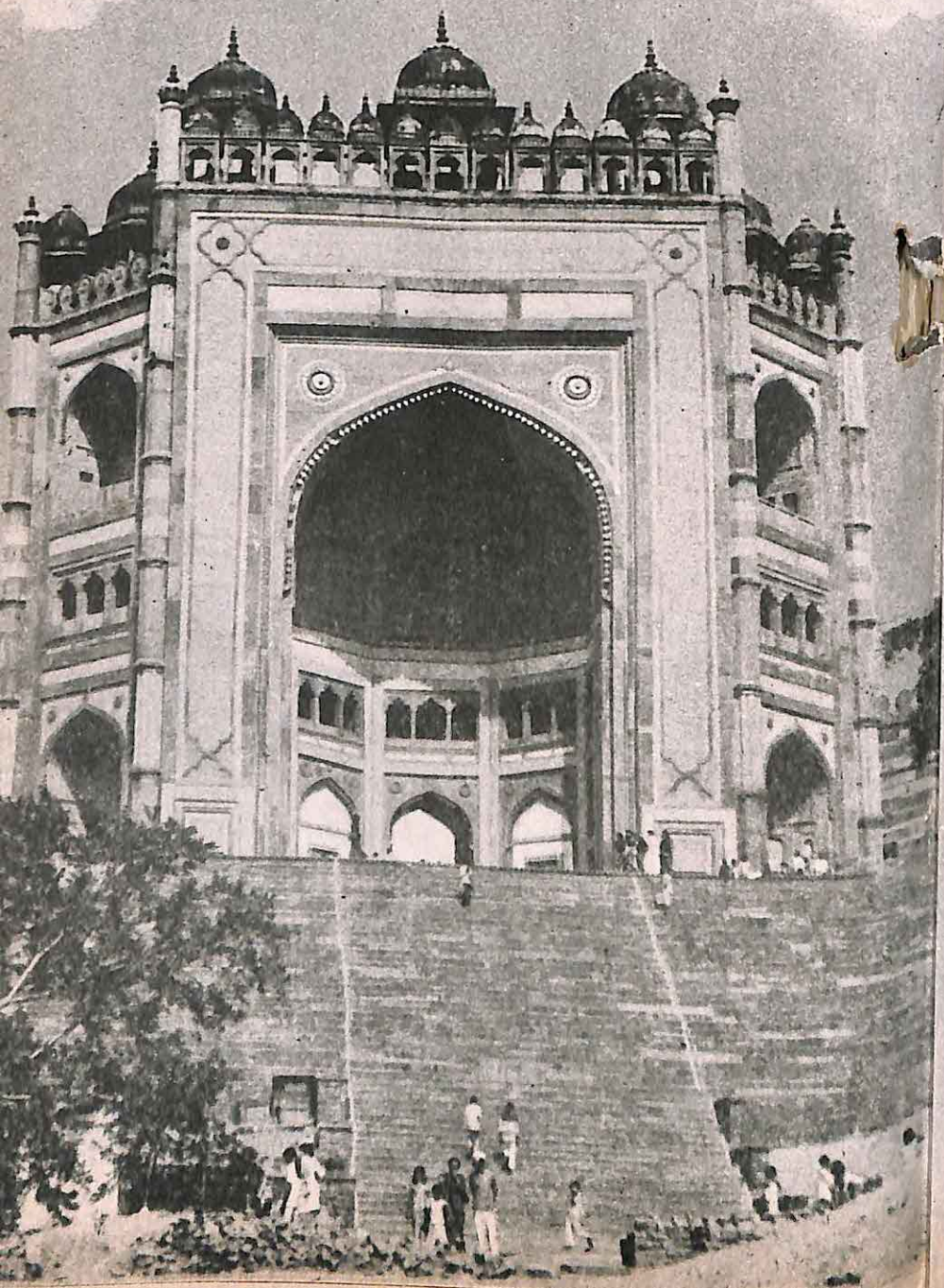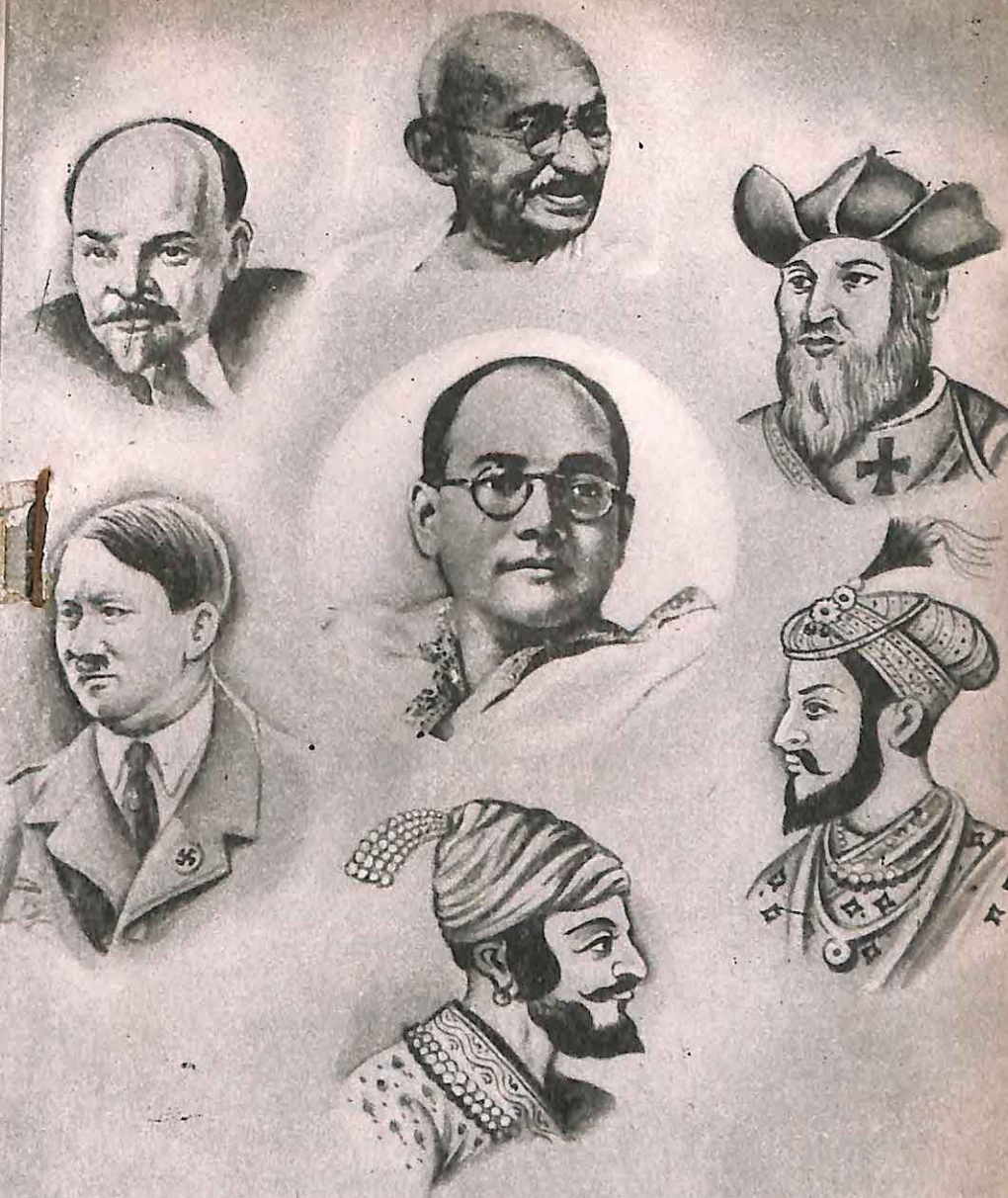
১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ—তুর্কীদের কাছে কনস্টান্টিনোপলের পতন।
১৪৫৩ ,, —রেনেসাঁসের যুগের সূচনা।
১৪৯২ ,, —কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।
১৪৯৮ ,, —ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন।
১৫২৬ ,, —পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৫৪৬-১৫৫৫	..	—জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধ।
১৫৮৭	..	—ইংল্যাণ্ডে স্পেনীয় আর্মাডার অভিযান।
১৬৮৮	"	—ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব।
১৬৯০	..	—কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রতিষ্ঠা।
১৭৩৯	..	—নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ।
১৭৫৭	..	—পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৭৫	..	—আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ।
১৭৮৯	..	—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।
১৭৮৯	..	—ফরাসী বিপ্লব।
১৮১৫	..	—ওয়াটারলুর যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পতন।
১৮৪০-৪২	"	—প্রথম চীন যুদ্ধ।
১৮৫৭	..	—সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ।
১৮৬১-৬৫	"	—আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।
১৮৬৭	"	—চীন-জাপানের বিপ্লব ; মেজি যুগের সূচনা।
১৮৭০-৭১	..	—ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ; ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৫	..	—বোম্বাই নগরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।
১৮৯৪-৯৫	"	—চীন-জাপান যুদ্ধ : চীনের পরাজয়।
১৯০০	..	—চীনে বক্সার বিদ্রোহ।
১৯০১	"	—জন্ হে-র উন্মুক্ত দ্বার নীতি-র প্রস্তাব।
১৯১১	"	—চীনের গণ-বিপ্লব : মাঞ্চু বংশের অবসান।
১৯১৪-১৮	..	—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : মিত্রপক্ষের জয়।
১৯১৭	..	—রুশ বিপ্লব।
১৯১৭	"	—বলশেভিকদের ক্ষমতালাভ (৭ই নভেম্বর)।
১৯১৯	..	—জার্মানীর সঙ্গে মিত্রপক্ষের ভার্সাই সন্ধি।
১৯২১-২২		—ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।
১৯৩৪	খ্রীষ্টাব্দ	—চীনে কমিউনিস্টদের 'লং মার্চ'।
১৯৩৯-৪৫	"	—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : মিত্রপক্ষের জয়।
১৯৪১	"	—রুজভেল্ট ও চার্চিল আতলান্তিক সনদের ঘোষণা করেন।
১৯৪২	"	—'ভারতছাড়' আন্দোলন।
১৯৪৫	"	—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৭	..	—ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতালাভ
১৯৪৯	"	—চীনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সূচীপত্র

শিখ স্থাপত্যের নিদর্শন : অমৃতসরের শিখ গুরুদ্বোয়ারার প্রবেশ তোরণ

ব্রিটিশ স্থাপত্যের নিদর্শন : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর এযাবৎ কালের ঘটনাগুলোর অন্যতম। এইযুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানী, ইতালি এবং জাপানকে নিয়ে গঠিত অক্ষশক্তি অপরদিকে ছিল কিছু নিরপেক্ষ দেশ ছাড়া অপরাপর দেশগুলোর মিত্রশক্তি। যুদ্ধের ব্যাপকতা এবং মারাত্মক সমরাস্ত্রের প্রয়োগে এই যুদ্ধ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ বলে পরিগণিত। এই যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হয়।

...য়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা।
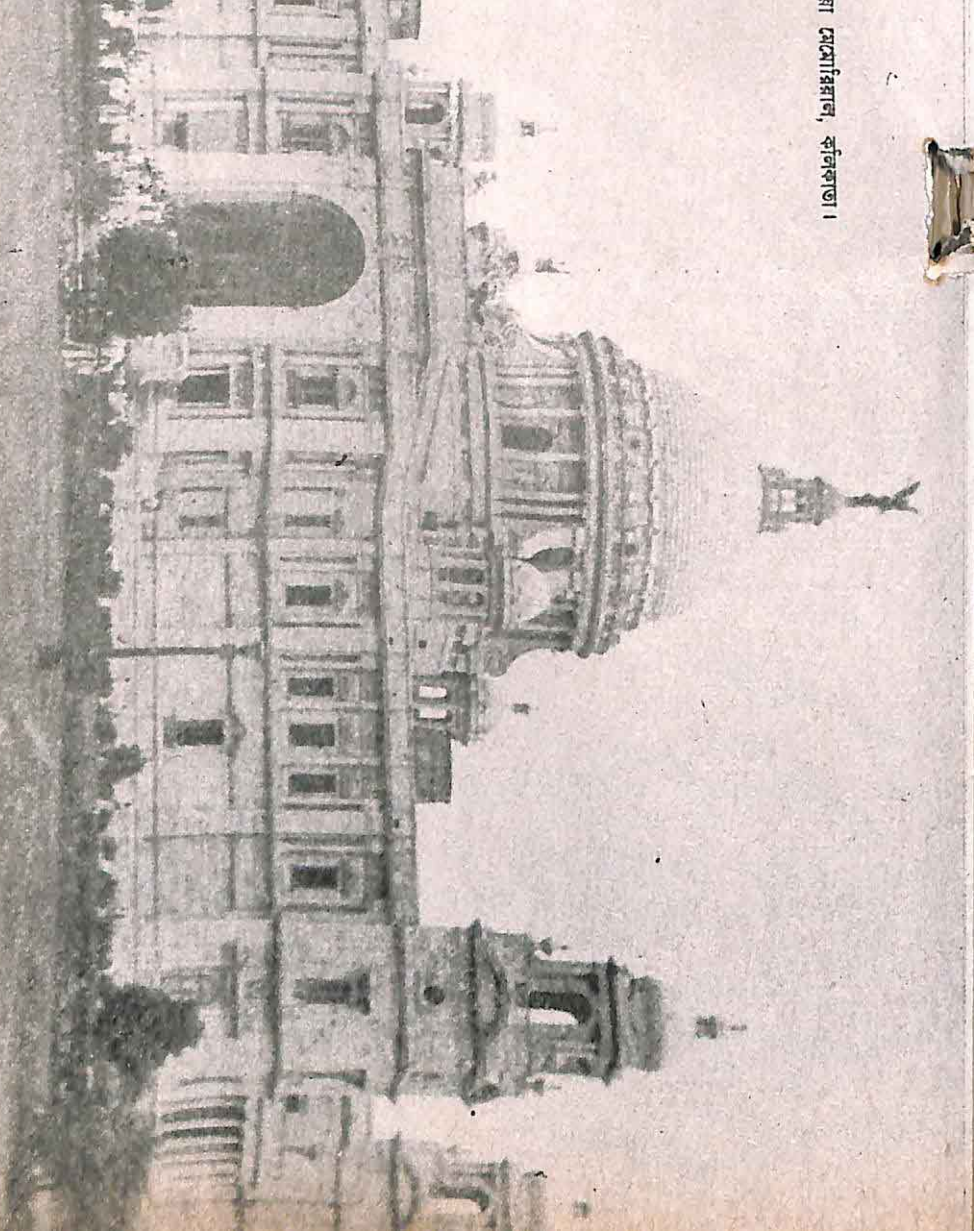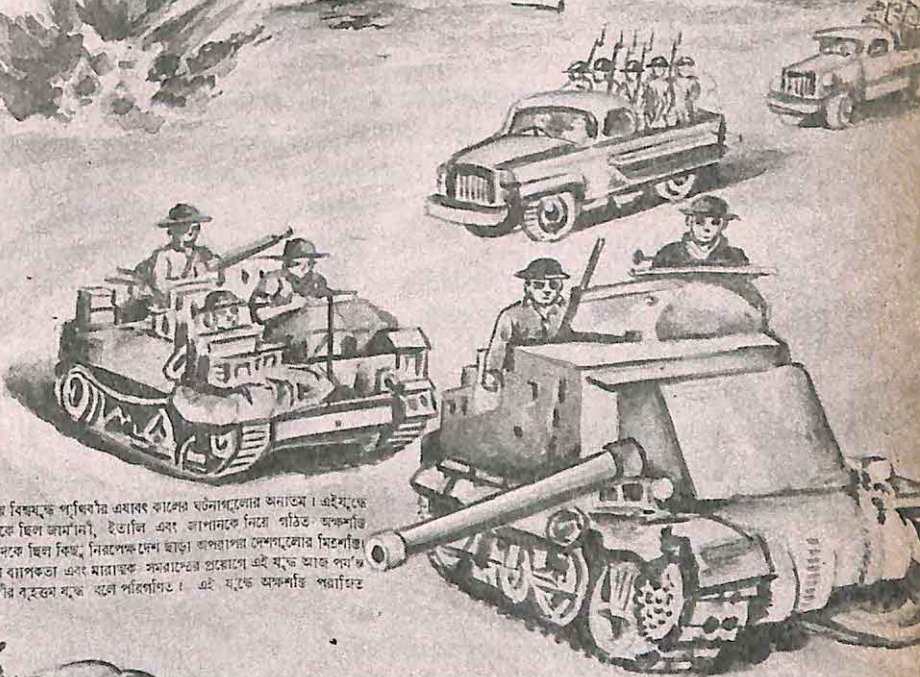
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর এযাবৎ কালের ঘটনাগুলোর অন্যতম। এইযুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানী, ইতালি এবং জাপানকে নিয়ে গঠিত অক্ষশক্তি অপরদিকে ছিল কিছু নিরপেক্ষ দেশ ছাড়া অপরাপর দেশগুলোর মিত্রশক্তি। যুদ্ধের ব্যাপকতা এবং মারাত্মক সমরাস্ত্রের প্রয়োগে এই যুদ্ধ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ বলে পরিগণিত। এই যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হয়।

পাঠ্যসূচী

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(SYLLABUS FOR HISTORY OF MODERN CIVILISATION)

অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের সংশোধিত পাঠক্রম

(১৯৮৩ শিক্ষাবর্ষ হইতে প্রবর্তিত হইবে)

১। **আধুনিক যুগ ঃ**

ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনঃ সামন্তপ্রথার অবক্ষয়—কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু উন্নয়ন—শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পশ্চাতে নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের অবদান—ইহার প্রভাব। … ২ পৃষ্ঠা

২। **ইউরোপের নবজাগরণ ঃ** (অত্যন্ত সহজ ও সরল উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়)

(ক) ইহার স্বরূপ ঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রবহমান এক বিবর্তনের ধারা কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের দ্বারা (১৪৫৩) উদ্দীপিত—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন—বৈজ্ঞানিক সত্য ও যাথার্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা—প্রাচীন গ্রীক জীবনচর্চার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—পরলোক-চিন্তা ও যাজকের মধ্যস্থতার প্রতি অনাস্থা—প্রথাগত কর্তৃত্বে অবিশ্বাস—প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে ঐশ্বরিক কোন অবদানকে অস্বীকার—যুক্তিবাদী মন লইয়া জীবন অনুসন্ধান—মানুষের গতানুগতিক সংস্কারকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের ব্যর্থ প্রয়াস—ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে এক যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ ও প্রসার।

(খ) ইতালীর নেতৃত্বদান—শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সের ধনী বণিকদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তথা হইতে মিলান, রোম এবং অন্যান্য নগর রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার—অতঃপর আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া জার্মানী, ফ্ল্যান্ডার্স, নেদারল্যান্ড, পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে উহার অনুপ্রবেশ। … ৩ পৃষ্ঠা

(i) **নব বোধোদয় বা মানবতাবাদ ঃ**

পরিশীলিত মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের বিকাশ ঃ সেই পরিপ্রেক্ষিতে দান্তে, পেত্রার্ক মেকিয়াভেলি, বোকাশিও, স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন্, চসার, স্পেন্সার, শেক্সপীয়ার, ইরাসমাস্, সারভান্তিস্ ও রাবেলের অবদান।

(জীবন-বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রয়োজন নাই। জীবন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসা জাগরণে তাঁহাদের অবদান উল্লেখ করিলেই চলিবে।)

(ii) **শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঃ** (অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প)

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো।

(iii) **বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঃ**

রোজার বেকন, স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, গুটেনবার্গ (মুদ্রাযন্ত্র)। ... ৬ পৃষ্ঠা

৩। **ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ঃ**

পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইতালীর নবজাগরণের মূলভাব পর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকদের উন্নতমানের বিভিন্ন যন্ত্রের (দিক্‌নির্ণয় ও উচ্চতামাপক যন্ত্র) সাহায্যে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করিল—প্রিন্স হেনরী, বারথেলোমিউ ডিয়াজ, আলবুকার্ক, ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, কলম্বাস, বালবোয়া, আমেরিগো ভেসপুচি, ম্যাগেলান।

ফলশ্রুতি ঃ (ক) মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি—নব আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিতি। (খ) জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ (গ) বাণিজ্যের প্রসার– উপনিবেশ স্থাপন—ঔপনিবেশিক শোষণ—স্পেনীয় নাবিকদের রাজ্য জয় (ঘ) জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান ... ৪ পৃষ্ঠা

৪। **ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ঃ**

(ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ [এই প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফ্, জন হাস্ ও মার্টিন লুথারের বাণী ও কর্মপদ্ধতি (গল্পচ্ছলে)]।

(খ) ফলাফল—জার্মানীর কয়েকটি রাজ্যে লুথেরান অথবা প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা—উত্তর ইউরোপ, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে প্রটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের প্রসার। (গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতির প্রয়োজন—যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন—দমনমূলক নীতি প্রয়োগ এবং যাজকদের বিচার-সভায় (Inquisiton Court) বিচারের দ্বারা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতবাদের উচ্ছেদ-সাধন—জেস্যুইট সোসাইটি কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট (১৫৪৫-১৫৬৩)। (ক্যাথলিক চার্চের অন্ধ বিশ্বাসের বিবরণ উপেক্ষা করিয়া কেবল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই চলিবে।)

(২) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ—প্রটেস্ট্যাণ্ট রাজ্য সমবায় বনাম পঞ্চম চার্লস্ (১৫৪৬-১৫৫৫)—অগস্‌বার্গের সন্ধি ১৫৫৫।

(বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই। কেবল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই চলিবে।)

(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা—তাঁহার অপশাসন ও প্রজাদের উপর অত্যধিক কর-স্থাপনের ফলে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ—উহার ফলাফল—১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং ডাচ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডে (অস্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ড) বেলজিয়াম নামে পরিচিত হইল (ক্যাথলিক রাজ্য)।

(ঙ) প্রটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য ফিলিপের প্রয়াস (সংক্ষিপ্তাকারে)—স্প্যানিশ আর্মাডা—ফিলিপের ব্যর্থতা। ... ১১ পৃষ্ঠা

১৪। ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ঃ

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন এবং ইউরোপের পুনর্গঠন—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব—জাতিসংঘ—উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা (সংক্ষেপে)। ... ৭ পৃষ্ঠা

১৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ

কারণ ও ফলাফল (বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই।) ... ৩ পৃষ্ঠা

১৬। ভারতবর্ষ (১৯১৮-১৯৪৭) ঃ

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর—অসহযোগ আন্দোলন—কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ—আইন অমান্য আন্দোলন—'ভারত ছাড়'—আজাদ হিন্দ্ ও গণমনে উহার প্রতিক্রিয়া—ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতালাভ। ... ১০ পৃষ্ঠা

১৭। চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯) ঃ

(ক) ইউ-য়ান্-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ-সেনের অন্তর্কলহে প্রজাতন্ত্রে ভাঙ্গন—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ানের মৃত্যু—তু-চুনদের (যোদ্ধৃগোষ্ঠী) কবলে চীন—সান্-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন্ তাঙ্ (জাতীয়তাবাদী দল)—তাঁহার তিনটি মৌলিক নীতি—৪ঠা মের আন্দোলন—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু—কুয়োমিন্ তাঙ্ ও চীনের কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (১৯২১-১৯২৪) ; চিয়াং কাইশেকের দমনমূলক নীতি—উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টদের ৬০০০ মাইল দীর্ঘ অভিযান—১৯৩৬ সালের সিয়াং-ফু ঘটনা—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনের উপর জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐক্যমত গঠনের প্রচেষ্টা—চীনের উপর জাপানী আক্রমণ ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মিলিত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা—চিয়াং ও তাঁহার কুয়োমিন্ তাঙ্ দল চীন হইতে ফরমোজার (তাই-ওয়ান) বহিষ্কৃত—১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মাওয়ের নেতৃত্বাধীন চীনের মূল ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। (সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে) ... ৫ পৃষ্ঠা

(খ) ১৯৫৫ সালের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া। ... ৩ পৃষ্ঠা

(গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার—আতলান্তিক সনদ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা—ইহার উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য—সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার। ... ২ পৃষ্ঠা

বক্তব্য বিষয়—১৪০ পৃষ্ঠা
অলংকরণ — ১৫ পৃষ্ঠা
অনুশীলনী—১০ পৃষ্ঠা

মোট—১৬৫ পৃষ্ঠা

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি

দ্বাদশ শতক থেকে ইউরোপে সামন্ত প্রথার দ্রুত অবক্ষয় ঘটতে থাকে ও সেই সঙ্গে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের এই যে রূপান্তর তা স্পষ্টভাবে দেখা যায় ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে।

সামন্ত প্রথার মূল ভিত্তি ছিল ভূমিদাস। এই ভূমিদাসরা কোথাও বিদ্রোহ করে ও কোথাও পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন প্রজায় রূপান্তরিত হয়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। অন্য দিকে ইউরোপের অনেক দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সেই সঙ্গে রাজাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় সামন্তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায়। রাজারা নতুন নতুন কর আদায় করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিয়ে ও প্রচুর পরিমাণে গোলা-বারুদ ও সৈন্য সংগ্রহ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং সামন্তদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনও রাজাদের ফুরিয়ে যায়। অন্য দিকে বণিক ও ব্যবসায়ীরাও স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ক্রমেই ধনী হয়ে উঠতে থাকেন ও সামন্তদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। ধর্মযুদ্ধে অনেকের মৃত্যু হয়। এমন কি সামন্তদের চাষীরাও চাষ-আবাদ ছেড়ে দলে দলে বণিক ও শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে সামন্তদের আর্থিক বিপর্যয় ঘটে।

আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল একদিকে সামন্তদের অবক্ষয় ও অন্যদিকে শিল্পের ও কৃষির উন্নয়ন। এই উন্নয়নের মূলে ছিল মানুষের চাহিদা ও বাজারের সম্প্রসারণ, নতুন নতুন জিনিস-পত্রের উৎপাদন, নতুন কলা-কৌশলের উদ্ভাবন ইত্যাদি। অন্য দিকে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নানা জিনিসপত্রের চাহিদাও বেড়ে যায়। ফলে বেশী পরিমাণে জিনিস-পত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয়। হাতের কাজের নতুন ধরন ও অনেককে নিয়ে একই সঙ্গে হাতের কাজের ব্যবস্থা করা হলে বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা সহজ হয়। একটা গোটা জিনিস একজন কারিগরকে দিয়ে তৈরী করার বদলে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কারিগরকে দিয়ে তৈরী করার ব্যবস্থা হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায় ও তা

শিল্পের উন্নয়ন: নতুন ফসলের অবদান

উন্নতমানের হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারিগরের কাজ ভাগ করে দেওয়া, জিনিসপত্র তৈরী করার উপাদান বা যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল যোগাড় করা—এ সবই বণিক ও ব্যবসায়ীরা করেন। জিনিসপত্র বিক্রী করার ব্যবস্থাও করেন বণিক ও ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে খনি থেকে লোহার পিন্ড বের করে বড় বড় কয়লার চুল্লিতে তা গালিয়ে—ঢালাই করা লোহা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করার কাজ শুরু হয়। সেই সঙ্গে তামা, টিন ও অন্যান্য ধাতু খনি থেকে বের করে নানা কাজে ব্যবহার শুরু হয়। ধাতুর তৈরী নানা হাতিয়ার তৈরী হওয়ায় শিল্পের উৎপাদনের কলা-কৌশল উন্নত হয়। একই সময় বায়ু-চালিত ও জল-চালিত চাকার উদ্ভাবন হয়। এর ব্যবহার শিল্পে ও চাষের কাজে আরম্ভ হয়। ইংলন্ড, ফ্লোরেন্স ও জার্মানীতে সুতী ও পশম শিল্পে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ক্রুসেডের পর ইউরোপে নতুন ফসলের চাষ শুরু হয়—যেমন যব, আখ, তুলো ও কতকগুলো লেবু জাতীয় ফল, পীচ ফল ইত্যাদি। বাজরা, রেশমগুটি ও লতাগুল্মের চাষও ব্যাপক হয়। শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এইসব নতুন ফসলের যথেষ্ট অবদান আছে। তুলোর চাষ শুরু হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে সুতা তৈরী হয় ও বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে। রেশমগুটির চাষ শুরু হওয়ায় রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন শুরু হয়। সুগন্ধি লতাগুল্মের সাহায্যে সুগন্ধি মদকে সুগন্ধি পানীয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। লোহার দাম সস্তা হওয়ায় লোহার ব্যবহার বেড়ে যায় এবং তা দিয়ে চাষের উপযোগী উন্নতমানের হাতিয়ার তৈরী হয়—যেমন লাঙলের ফলা, কোদাল, লোহার মই, খুরপী, কাস্তে ইত্যাদি। ফলে চাষীদের জন্য এতদিন ধরে কাঠের যেসব হাতিয়ারের চলন ছিল তা বাতিল হয়। বায়ু-চালিত চাকা দিয়ে নদী-নালা থেকে জল তুলে তা চাষের জমিতে দেওয়ার রীতি শুরু হয়। সেই সঙ্গে জমিতে কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথা চালু হলে ফলন খুব বেড়ে যায়। মুদ্রায় খাজনা দেওয়ার রীতি শুরু হলে কৃষকরা বেশী করে ফসল ফলাতে আগ্রহী হয়, কারণ খাজনা মেটাবার পর উদ্বৃত্ত টাকা তারা নিজেরা ভোগ করত। ফলে কৃষকরা বেশী জমি আবাদ করে ফলন বাড়াতে উৎসাহী হয়। ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপের ধর্মযোদ্ধারা মধ্য-প্রাচ্য থেকে পীচ ফল ও

কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন

স্পিনেজ নামে এক ধরনের সব্জী নিয়ে আসেন। পরে এইসব ফলের ব্যবসায়ী-ভিত্তিক বাগানের পত্তন হয়।

উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নত হওয়ার ফলে শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বেড়ে যায় ও সেই সংগে এগুলোর দামও সস্তা হয়। বেশী পরিমাণে শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বণিকেরা ধনী-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয় ও ইউরোপে পুঁজিপতি বণিকযুগের সূচনা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ গড়ে ওঠে তা বণিক ও শিল্পপতিদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। নতুন নতুন চাষ আবাদ ও শিল্পোৎপাদনের কলা-কৌশল উন্নত হওয়ায় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু উৎপাদন প্রণালী উন্নত হওয়ায় আগের যুগের কারিগররা ও শিল্পী-সংঘের ওস্তাদরা ধনী বণিকদের সংগে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হয়ে সামান্য মজুরে পরিণত হয়। চাষের উন্নতি হওয়ায় বড় বড় জমিদার ও জোতদাররা জমি-জায়গা কিনে মজুর দিয়ে চাষ-আবাদ শুরু করলে অসংখ্য চাষী জমি থেকে উৎখাত হয়ে বেকারে ও শ্রমজীবীতে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলাফল

অনুশীলনী

১। সামন্তপ্রথার অবক্ষয়ের কারণ কি?

২। আধুনিক যুগের শুরুতে শিল্পের উৎপাদনে কি কি পরিবর্তন এসেছিল? এই পরিবর্তনের ফল কি হয়েছিল?

৩। আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষির উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন কিভাবে এসেছিল? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৪। আধুনিক যুগের শুরুতে শিল্পের ও কৃষির উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের ফল কি হয়েছিল?

ইউরোপের নবজাগরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবজাগরণের প্রকৃতি

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের যে বিবর্তন, তা এসেছিল চিন্তা ও ভাবজগতের এক মহান আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। এই আন্দোলন ইউরোপের ইতিহাসে **রেনেসাঁস** বা নবজাগরণ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকরা নবজাগরণের যুগকে বর্তমান ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণ বলে মনে করেন।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের সব বিষয়ে জানবার আগ্রহ এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে তা গ্রহণ করার প্রবণতা। সারা ইউরোপ জুড়ে নবজাগরণের এই যে আন্দোলন তা এক দিনেই ঘটে নি। দ্বাদশ শতক থেকেই এর সূচনা হয় এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগ ছিল কুসংস্কারের যুগ—অন্ধ-বিশ্বাসের যুগ। এই যুগে মানুষের স্বাধীন চিন্তার এবং মহৎ বা দুঃসাহসিক কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ ও সাহস ছিল না। মানুষের সব কিছুই ধর্মগুরু, পোপ ও পাদরীরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। গির্জা এবং পাদরীদের অনুশাসন ও নির্দেশ সকলকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হত। শিক্ষা ছিল ধর্মাশ্রয়ী। সকলকে প্রচলিত বিশ্বাস, প্রচীন পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত ও ধর্মের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত। পাদরীরা মানুষকে আত্মার মুক্তি এবং পাপ ও পুণ্যের কথা শোনাতেন ; গির্জাকে অন্ধভাবে মান্য করতে শেখাতেন ; সংসারের সব রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে শুধু পরলোকের চিন্তাই করতে বলতেন। গির্জা ও পাদরীদের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। তাকে ধর্মচ্যুত ও সমাজচ্যুত পর্যন্ত করা হত।

কিন্তু এই অন্ধ সংস্কারের যুগও একদিন শেষ হয়ে আসে। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় যাঁদের বলা হয় '**স্কুলমেন**'। তাঁরাই খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রথম চেষ্টা করেন। তাঁরা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে যুক্তি তর্ক দিয়ে তার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে সব কিছুর বিচার করার কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেন নরম্যাণ্ডির এক পাদরী সেন্ট আনসেম (১০৩৩-১১০৯ খ্রীঃ)। তিনি প্রচার করেন যে "আমি নিজে যা বুঝি তাই বিশ্বাস করি"। এর পর দ্বাদশ শতকে

প্যারিসের স্কুলমেন গোষ্ঠীর এক খ্যাতনামা পণ্ডিত এবিলার্ড (১০৭৯-১১৪২ খ্রীঃ) ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি প্রচার করেন যে ঈশ্বর বলেছেন বলেই কোন ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করা যায় না যদি না যুক্তিতর্ক দিয়ে তা যাচাই করা যায়। তিনি ঘোষণা করেন জ্ঞানার্জনের প্রথম কথাই হল সন্দেহ এবং যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তার নিরসন করা। গির্জার অনুশাসনের বিরুদ্ধে এইসব মতামত প্রচার করার জন্য এবিলার্ডকে ধর্মদ্বেষী বলে ভংর্সনা করা হয়। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। গির্জার অনুশাসন-বিরোধী কোন আলোচনা সেখানে হত না। তা সত্ত্বেও 'স্কুলমেন' নামে পণ্ডিতরা নানা বিষয়ে তর্ক ও আলোচনার অবতারণা করে নতুন পথের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করতেন। ফলে মধ্যযুগের অন্ধসংস্কার কিছুটা কেটে যায়। কিছুদিন পরে ইটালী প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা নতুন করে শুরু হয়। এই চর্চার ফলে মানুষ বুঝতে শুরু করে যে এই জগৎ আনন্দময় এবং দেহের ও মনের উন্নতি সাধনই হল জীবনের উদ্দেশ্য। তারা এও বুঝতে শুরু করে যে প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা বিচার ও বিশ্লেষণ না করে কোন কিছুই মেনে নিতেন না এবং পার্থিব ভোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পাপ বলেও মনে করতেন না। মানুষের মনের এই নতুন চিন্তাধারাই হল নবজাগরণ। গির্জা ও পাদরীদের আধিপত্যের অস্বীকার, প্রবল জাতীয় মনোভাবের উদ্ভব এবং বাইবেলের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়েই শিক্ষা ও সংস্কৃতি নব জন্ম লাভ করে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হলে ইউরোপের মানুষ জগতের সব কিছু জানবার ও ভোগ করার জন্য অধীর হয়ে উঠে।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হাতে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলের পতনের সময় থেকেই সাধারণতঃ রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আরম্ভ বলে মনে করা হয়। তুর্কীরা কনস্টাণ্টিনোপল দখল করে নিলে বহু গ্রীক পণ্ডিত তাঁদের মূল্যবান পুঁথিপত্রগুলি নিয়ে ইটালীর বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেন। এর ফলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটে।

ইউরোপের নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইটালীতে। ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি ইটালীর বিখ্যাত নগরগুলো আরবদের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সামন্তদের প্রভাব-

প্রতিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই এই নগরগুলো গড়ে ওঠে। কাজেই এইসব নগরের নাগরিকদের মনে স্বাধীন চিন্তাধারা ও অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা বেশ প্রবল ছিল। আবার এইসব নগরের শাসকেরাও ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রাসাদ ও শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি তাঁদের খুবই আকর্ষণ ছিল। কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের পর ইটালীর নগরগুলোতে গ্রীক পণ্ডিতরা সমাদর পান। ফলে পঞ্চদশ শতকে গ্রীস ও রোমের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইটালীর সব-জায়গায় নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্লোরেন্স নগরেই এর প্রথম সূচনা হয়। এই নগরে প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্যোক্তা ছিলেন শহরের দুই শাসক কসিমো এবং লরেঞ্জো-দা-মেডিসি। কসিমো ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের ও লরেঞ্জো ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। ফ্লোরেন্সের বড় বড় অভিজাত পরিবার ও বণিকেরা শাসকদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ফলে ফ্লোরেন্স দ্বিতীয় এথেন্স নামে গৌরব লাভ করে। ফ্লোরেন্সের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মিলান, রোম ও অন্যান্য নগরের শাসক এবং নাগরিকরাও গ্রীক পণ্ডিত ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করেন। মিলানের শাসক ও বণিকেরা নগরকে শিল্প-সৌন্দর্যে গড়ে তোলেন। রোমের পোপ লিও (১৫১৩-২১ খ্রীঃ) রোমনগরীকে শিল্পকলা ও শিক্ষার এক উজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত করেন। প্রাচীন যুগের পুঁথিপত্র সংগ্রহ করবার ব্যাপারেও ইটালীর নাগরিক ও বণিকেরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।

ইটালীতে নব-জাগরণের সূত্রপাত

ইটালীর নবজাগরণের ঢেউ আল্পস্ পর্বতমালা পেরিয়ে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্ল্যান্ডার্স, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ভেনিস ও মিলান শহরে জার্মান বণিকদের আনাগোনা আগে থেকেই ছিল। তারা ইটালীর শিল্প-কলার খুবই অনুরাগী ছিলেন। রোমে জার্মান তীর্থ-যাত্রীদের আনাগোনা এবং বোলন, পাডুয়া প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জার্মান বিদ্যার্থীদের যোগদান প্রভৃতি কারণেও ইটালীর নবজাগরণের প্রভাব জার্মানীতে স্বাভাবিক-ভাবেই এসে পড়ে। ফ্রান্সে নবজাগরণের সূচনা হয় গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের চর্চার মধ্যে দিয়ে। সেখানে গ্রীক সাহিত্যের অবলম্বনে নাটক ও কাব্যের সৃষ্টি হয়। স্পেনে সিড নামে কবিতা স্পেনীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। ইংল্যান্ডে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইটালীর

ইউরোপের অন্যান্য দেশে নবজাগরণের প্রসার

আল্পস্

করিন্থিয়া

ভেনিস

মিলান

জেনোয়া সাধারণতন্ত্র

ফ্লোরেন্স

লিগুরিয়ান সাগর

বোসনিয়া

ডালমাটিয়া

আড্রিয়াটিক সাগর

রোম

টাইরেনিয়ান সাগর

সিসিলি

রেনেসাঁসের সময়ে ইটালী
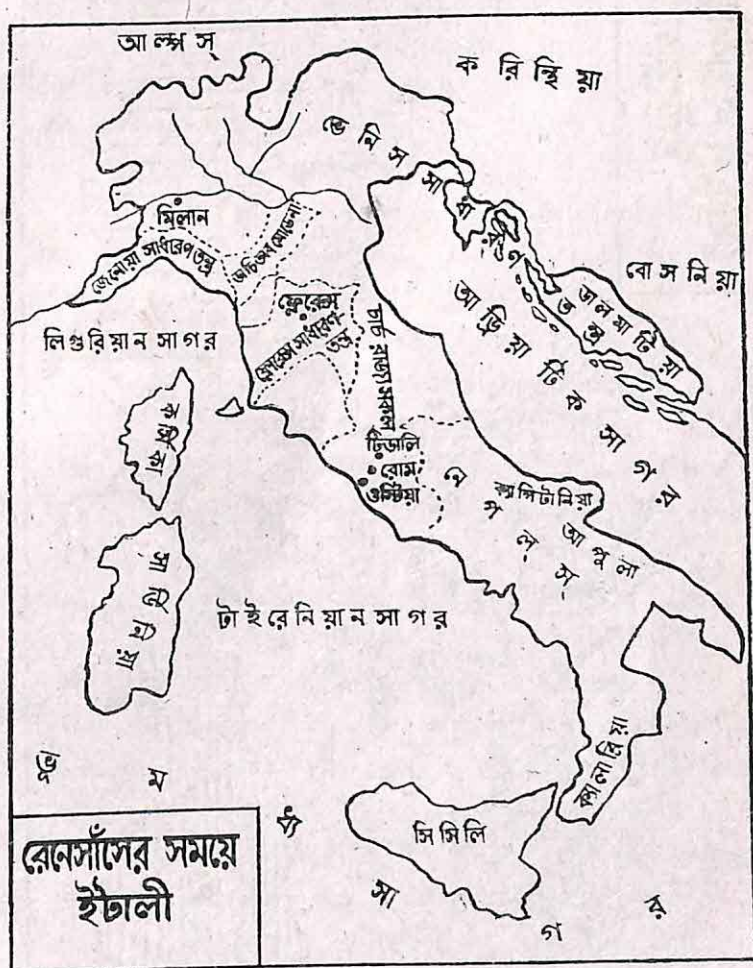
ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ
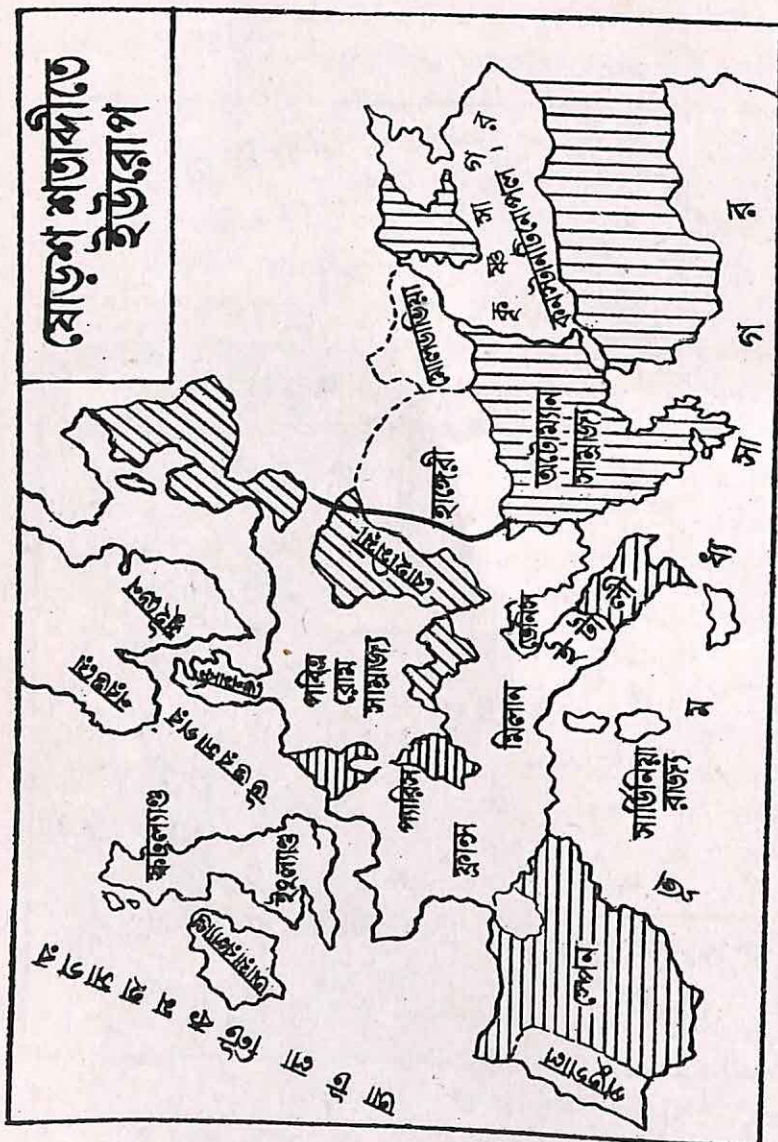
রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা যায় থোমাস মোর-এর রচিত 'ইউটোপিয়া' নামে এক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে আদর্শ সমাজের এক ছবি পাওয়া যায়। রাণী প্রথম এলিজাবেথের আমলে ইংল্যান্ডে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। নেদারল্যান্ডে নবজাগরণের সূচনা করে 'ডেভেন্টার' নামে এক স্কুল-সমিতি। এই সমিতির শিক্ষার আদর্শ ইউরোপের মানবতাবাদীদের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া নেদারল্যান্ডের শিল্পীরা ইটালীর প্রাচীন শিল্পকলার অনুকরণে শিল্পের সৃষ্টি করেন। পর্তুগালে নবজাগরণের প্রভাব ক্যামেওনস-এর রচিত 'লুসিয়াড' নামে এক মহাকাব্যে দেখা যায়।

ইটালীর চিত্র শিল্পীদের সংগে ফ্ল্যান্ডার্স-এর চিত্র শিল্পীদের যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তাঁরাও ইটালীর শিল্পীদের অনুকরণে শিল্পের সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মাবুস-এর।

(২) চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঃ মানবতাবাদ

মানবতাবাদ বলতে কি বুঝায়

ইউরোপে যাঁরা রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রবর্তন করেন তাঁরা 'মানবতাবাদী' বা 'হিউম্যানিস্ট' নামে পরিচিত। কারণ তাঁরা ধর্মচর্চা ছাড়াও সাহিত্যের চর্চা করতেন ও মানুষের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও চিন্তা করতেন।

সাহিতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

ইটালীতে নবজাগরণের প্রথম বিকাশ ঘটে সাহিত্যে। মধ্যযুগের শেষের দিকে ফ্রান্সের গীতিকাব্য থেকেই ইটালীর জাতীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। কিন্তু তখন ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা চালু থাকার ফলে ইটালীর জাতীয় ভাষার উন্মেষে কিছু দেরী হয়। ইটালীর জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা হলেন দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও। এঁরা তিনজনেই টাস্কানীর আঞ্চলিক ভাষা সংশোধন করে ইটালীর জাতীয় ভাষার পত্তন করেন।

দান্তে (১২৬৫-১৩২১খ্রীঃ)

দান্তে ছিলেন ফ্লোরেন্স নগর রাষ্ট্রের নাগরিক ও কবি। তিনি ল্যাটিন ভাষায় বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু পরে তিনি নিজের নগর-রাষ্ট্র টাস্কানের টাস্কান ভাষায় রচনা শুরু করেন। ঐ ভাষা ক্রমে ইটালীর ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাঁর রচিত 'ডিভাইন-কমেডি' ইটালীর সাহিত্যের এক অমূল্যসম্পদ। এই কাব্যে তিনি তাঁর যুগের ধ্যান-ধারণার সমালোচনা করেছেন। দান্তে-কে ইটালীর নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

পেত্রার্ক ছিলেন ইটালীর নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। তিনি পশ্চিম

ইউরোপের অনেক ধর্মমন্দির ও শিক্ষায়তন থেকে মূল্যবান প্রাচীন পুঁথিপত্র নকল করে এনেছিলেন। তিনি-ই সকলের আগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করে তার প্রচার করেন। তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র পাঠ করে তার সৌন্দর্য সকলের কাছে ব্যাখ্যা করেন। দান্তের মত পেত্রার্কও সমকালীন যুগের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি মানবপ্রেম ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা লিখে মানুষের মনে প্রকৃতি সম্পর্কে আনন্দ দেন। পেত্রার্ক একদল উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান মানব-বাদীদের নিয়ে এক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মধ্যে জেওভানি বোকাচ্চিওর নাম করা যায়।

পেত্রার্ক
(১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ)

পেত্রার্ক

বোকাচ্চিও ইটালীর প্রাচীন আখ্যান ও উপাখ্যান সংগ্রহ করে 'ডেকামেরণ' নামে এক গল্পগুচ্ছ রচনা করেন। তিনি গ্রীক ও রোমান সাহিত্য নকল করে দেশবাসীর কাছে তার গৌরব প্রচার করেন। বোকাচ্চিও-র একান্ত অনুরোধেই গুরু পেত্রার্ক হোমারের দু খানি অমূল্য গ্রন্থ 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ পেলে ইটালীর পণ্ডিতদের মধ্যে গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে।

বোকাচ্চিও
(১৩১৩-৭৫ খ্রীঃ)

সেযুগে রাজনীতিবিদ হিসাবে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেন ফ্লোরেন্স-নিবাসী মেকিয়াভেলি। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দেন। তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা যায়। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'দি প্রিন্স'। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার এক নতুন আদর্শের কথা প্রচার করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করেন।

মেকিয়াভেলি
(১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ)

ইংল্যাণ্ডের মানবতাবাদী মনীষিদের মধ্যে চসার, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, স্পেনসার ও শেক্সপীয়রের নাম প্রথমেই করা যায়।

চসার-এর জন্ম হয় মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে। তাঁকে ইংরাজী কাব্যের জনক বলা হয়। তাঁর রচনায় একদিকে অস্তমিত সামন্ত যুগের ও অন্যদিকে নবাগত স্বাধীন চিন্তা ও শিক্ষামূলক যুগের প্রভাব দেখা যায়। যে গ্রন্থ লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন তার নাম 'কেণ্টারবেরী-টেলস্'। তাঁর যুগের ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজের সব স্তরের মানুষের আচার-আচরণ ও তাদের মনোভাবের এক সুস্পষ্ট ছবি এতে পাওয়া যায়। গির্জার পাদরীদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অশ্রদ্ধা এবং স্বাধীন চিন্তা করার প্রবণতা এই কাব্যে প্রকাশ পায়। তাছাড়া চসারের এই কাব্যে স্যাক্সন ও নরমান ভাষার মিশ্রণে ইংরাজী ভাষার প্রকাশ দেখা যায়।

চসার (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ)

ফ্রান্সিস বেকন নামে ইংল্যাণ্ডের এক খ্যাতনামা পণ্ডিতের প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। তিনি ইংরাজী দর্শনের আদিগুরু। তিনি ইংরাজী প্রবন্ধ-সাহিত্যকে নতুন রূপ দেন। তিনি একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন।

ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রীঃ)

কবি ও নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়র আজও অমর হয়ে আছেন। শেক্সপীয়র তাঁর 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'কিং লীয়ার' প্রভৃতি নাটকে সে যুগের মানুষের চিন্তাধারা ও মানব চরিত্রের সর্বদিক নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকে তিনি রাজার নেতৃত্বে জাতীয় শান্তি ও সংহতির কথা প্রচার করেন। সেই সঙ্গে তিনি মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি কাব্যকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করতেন।

শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ)

শেক্সপীয়ার

রাণী প্রথম এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডে কাব্য-প্রতিভার এক অভাবনীয় উন্মেষ হয়। ফরাসী কবিদের মত ইংরাজ কবিদেরও কাব্যের প্রেরণা ছিল প্রেম ও প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিকে নিয়ে এডমণ্ড স্পেনসার

এডমণ্ড স্পেনসার

তাঁর বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের নাম 'শেপার্ডস-ক্যালেন্ডার'।

নবজাগরণের যুগে নেদারল্যান্ডের মানবতাবাদীদের অন্যতম ছিলেন ইরাসমাস। তিনি ল্যাটিন ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য চর্চায় সারা জীবন কাটান। এই কারণে তাঁকে 'মানবতাবাদীদের যুবরাজ' (**'Prince of Humanists'**) বলা হত। তিনি গির্জার দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ধর্মকে নিছক ধর্ম অপেক্ষা দৈনন্দিন জীবনের পথ-নির্দেশিকা বলে মনে করতেন।

ইরাসমাস (১৪৬৯-১৫৩৬ খ্রীঃ)।

সেযুগের প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ কবিতার লেখক ছিলেন স্পেনের সারভান্তিস্। তাঁর বিখ্যাত রচনা হল 'ডন-কুইকসোট'। এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের 'নাইট' ও তাঁদের 'বীর ধর্মের' (**chivalry**) এক মনোজ্ঞ ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন। তিনি নাইটদের অতিরঞ্জিত বীরদর্পের কাহিনীর প্রতি কঠোর কটাক্ষ করেছেন।

সারভান্তিস্ (১৫৪৭-১৬১৬ খ্রীঃ)

ফ্রান্সে নবজাগরণ-যুগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাবেল। তিনি সেযুগের জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা হল 'প্যান্টাগ্রুয়েল ও গারগাণ্টুয়া'। তিনি মধ্যযুগের সংকীর্ণ তপস্যার নিন্দা করে আনন্দময় জীবনের আদর্শ প্রচার করেন।

রাবেল (১৪৯০-১৫৫৩ খ্রীঃ)

শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নবজাগরণের প্রভাব সীমিত ছিল না। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও এই প্রভাব প্রকাশ পায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও তার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন শিল্পকলার পুনরুদ্ধারও নবজাগরণ-যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিল্পের চর্চা নতুন করে শুরু হয়, কারণ মধ্যযুগে শিল্পকলা সাবলীল ছিল না এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্যও ছিল না। কিন্তু নবজাগরণের প্রভাবে শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা নিয়ে শিল্প-সৃষ্টির কাজে মেতে ওঠেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

নবজাগরণ-যুগের শিল্পীদের অনেকের বহুমুখী প্রতিভা ছিল, যেমন

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। তিনি একাধারে ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, বিজ্ঞানী, কবি ও দার্শনিক। তাঁর আঁকা ছবিগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'দি লাস্ট সাপার' ও 'মোনালিসা'। মোনালিসা ছবিটি প্যারিসের লুভর যাদুঘরে রাখা আছে।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রীঃ)

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির মতই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ভাস্কর এবং তাঁর ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্কর্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পেও তাঁর প্রতিভা ছিল। রোমের সেণ্ট পিটার গির্জা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর শিল্প-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস্কর্য শিল্পে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় ফ্লোরেন্সে ডেভিডের মূর্তিতে। তাঁর আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল 'শেষ বিচার' ও রোমের সিসটাইন গির্জার দেওয়াল-ছবি।

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রীঃ)

ইটালীর অপর প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন রাফায়েল। তাঁকে তাঁর সমসাময়িক পোপ ও রাজারা শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে সম্মান দেখাতেন। তাঁর আঁকা ম্যাডোনা—অর্থাৎ মাতা মেরীর কোলে যীশুর ছবি, ছবির জগতে এক অমূল্য সম্পদ। এছাড়া রোমে পোপের প্রাসাদের কতকগুলো দেওয়াল ছবি তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০ খ্রীঃ)

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নবজাগরণের প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চর্চাকে গির্জার পাদরীরা মোটেই সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনের পুনরুদ্ধারের ফলে পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তার স্বাধীনতা আবার জেগে ওঠে এবং তা থেকেই জন্ম হয় আধুনিক বিজ্ঞানের।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

নবজাগরণ-যুগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী রোজার বেকনের। যন্ত্রবিদ্যা, আলোক-বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রোজারের গভীর প্রতিভা ছিল। এই কারণে তাঁকে 'বিস্ময়কর ডাক্তার' (**Wonderful Doctor**) বলা হত। আরব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী

রেজার বেকন (১২১৪-৯২ খ্রীঃ)

করার পদ্ধতি বর্ণনা করেন এবং পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি পালবিহীন জাহাজ ও আকাশ যানের পরিকল্পনার কথাও প্রচার করেন। বেকনের এই সব উদ্ভাবন গির্জার অনুশাসনের বিরোধী বলে বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে যাদুকর বলে চোদ্দ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ওপাস মাজুষ'।

সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের অপর এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগীর বিশ্লেষণ করে প্রচার করেন যে একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই প্রকৃতির রহস্য জানা যায়। তাঁর মতে বিজ্ঞানী প্রথমে তার চারিদিকে যা ঘটছে তা সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য করার পর সেই ঘটনার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে বা বিশ্বাসে পৌঁছুবে এবং তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘটনার রহস্য আবিষ্কার করবে।

নবজাগরণ-যুগের আর এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন পোল্যাণ্ডের কোপারনিকাস। প্রাচীনকাল থেকেই লোকে বিশ্বাস করত যে পৃথিবী হল সৌর জগতের কেন্দ্রস্থল এবং সূর্য, চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র সব কিছুই তাকে ঘিরে ঘুরছে। কোপারনিকাস প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী সৌরগজতের কেন্দ্রস্থল নয়—সে নিজেই সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বাইবেল-বিরোধী হওয়ায় স্বভাবতই তা খ্রীষ্টানজগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। গির্জার হাতে শাস্তির ভয়ে কোপার্নিকাস তাঁর সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করতে সাহস পাননি।

কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ)

কোপারনিকাসের মৃত্যুর পরে ইটালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত প্রমাণ দেন। দূরের জিনিষ বড় করে দেখার উপায় হিসাবে তিনি 'দূরবীক্ষণ' নামে এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে অবিরত ঘুরছে। পোপ ও খ্রীষ্টান পাদরীরা—গ্যালিলিও-র মতবাদকে অশাস্ত্রীয় বলে তাঁকে যাজকদের আদালতে অভিযুক্ত করেন। তাঁর শেষজীবন এক রকম বন্দী অবস্থায় কাটে।

গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীঃ)

ইটালীর অপর এক বিজ্ঞানী ছিলেন শিল্পী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। তিনি যন্ত্রবিদও ছিলেন। তিনি আকাশ যানের সম্ভাবনার কথা প্রচার করেন এবং তার একটি নকশাও তিনি তৈরী করেন।
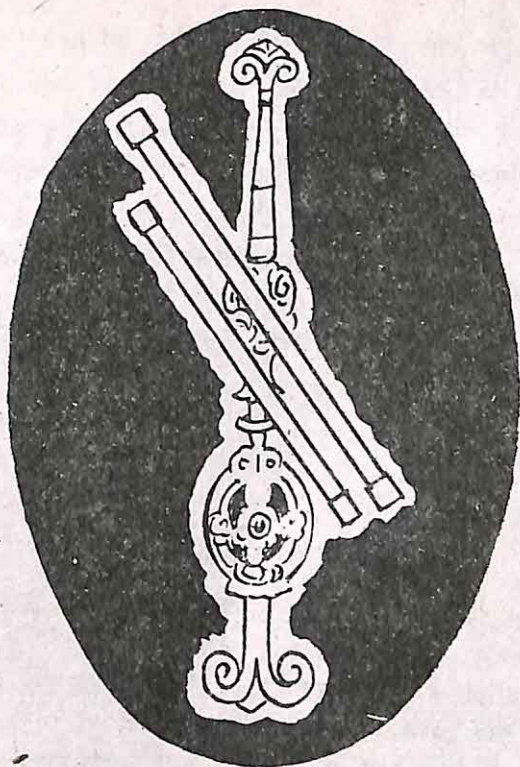
গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ
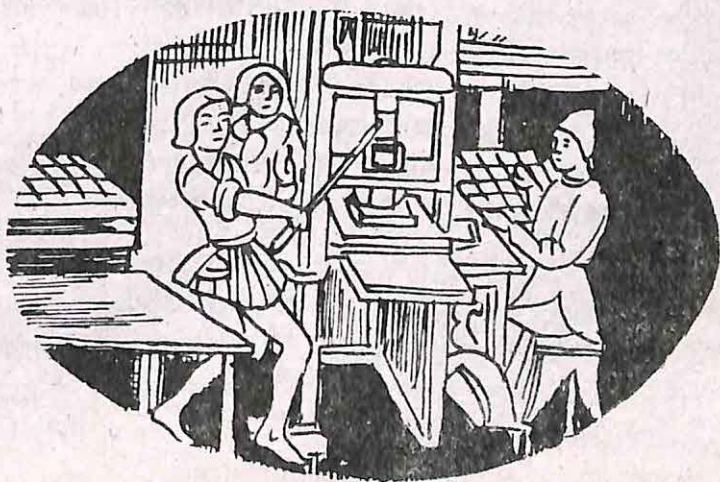
প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র

নবজাগরণ-যুগের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হল ছাপাখানার আবিষ্কার। মধ্যযুগে সব পুঁথিপত্রই হাতে লেখা হত। একটা পুঁথির নকল করতে অনেক সময় ও খরচ লাগত। গুটেনবার্গ নামে এক জার্মান পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি মেইনট্‌স্ শহরে এক ছাপাখানা স্থাপন করেন। প্রাচীনকালে কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপার কাজ করার রীতি চীন দেশে প্রচলিত ছিল। গুটেনবার্গ অক্ষর-বিশিষ্ট ধাতুর টাইপ তৈরী করার কৌশল আবিষ্কার করলে মুদ্রণশিল্পে যুগান্তর আসে। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার হবার পর অল্প সময়ে ও কম খরচে অনেক বই ছাপা সহজ হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের পথ আরও প্রশস্ত হয়।

গুটেনবার্গ
(১৪০০-৬৮ খ্রীঃ)

অনুশীলনী

১। 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ বলতে আমরা কি বুঝি? কোন্ সময় থেকে নবজাগরণ-যুগ শুরু হয়?

২। ইউরোপে নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি জান?

৩। ইটালীতে নবজাগরণের সূচনার কারণ কি?

৪। নবজাগরণে ফ্লোরেন্স, ভেনিস ও মিলান নগরগুলোর অবদান কি?

৫। ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে নবজাগরণ প্রথম সূচনা হয়েছিল?

৬। মানবতাবাদী' কাদের বলা হত? ইটালীর কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম কর। তাঁদের সম্বন্ধে কি জান?

৭। নবজাগরণ-যুগের শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি? ইটালীর কয়েকজন শিল্পীর নাম কর। তাঁদের খ্যাতিলাভের কারণ কি?

৮। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব কি রকম হয়েছিল? কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম কর। তাঁদের খ্যাতিলাভের কারণ কি?

ইউরোপীয় জগতের পরিধি-বিস্তার

তৃতীয় অধ্যায়

বিস্তৃতির কারণ

আমরা আগেই দেখেছি যে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন আসে। উৎপাদন প্রণালী উন্নত হওয়ায় শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন খুবই বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি হয় ও শহরগুলোর লোক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। ফলে নানা ধরণের জিনিষ-পত্রের চাহিদাও বেড়ে যায়। সুতরাং নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন থেকেই নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয় পঞ্চদশ শতক থেকে। আমরা এও দেখেছি যে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব ও অজানাকে জানবার আগ্রহ থেকেই নবজাগরণের সূচনা হয় এবং সাহিত্য, ভাষা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ পায় নতুন পথের সন্ধান। নবজাগরণের ফলে ইউরোপবাসীদের মনে যে সাহস, উৎসাহ ও কৌতুহলের সঞ্চার হয়েছিল তা তাদের নানা দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা দেয় এবং অজানাকে জানবার নেশায় তারা মেতে ওঠে। এই প্রেরণা থেকেই পৃথিবীর অজানা দেশ, মহাদেশ ও বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করার জন্য তারা দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। তাদের লক্ষ্য ছিল অজানা দেশ ও মহাদেশ আবিষ্কার করে সেগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা।

'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের পর ইউরোপে প্রাচ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়ে যায়। মধ্যযুগের শেষের দিকে বহু বণিক ও পর্যটক প্রাচ্যে ভ্রমন করে এই সব দেশের অনেক সংবাদ ইউরোপবাসীদের জানান। এদের মধ্যে মার্কোপোলো নামে ইটালীর এক নাগরিক চীন, সিংহল, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসে, এই সব দেশের অগাধ ঐশ্বর্য ও সম্পদের কথা ইউরোপবাসীকে শোনান। ফলে ইউরোপবাসীদের মনে প্রাচ্যের দেশগুলো সম্বন্ধে গভীর কৌতুহল জেগে ওঠে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপীয়দের ভৌগলিক জ্ঞান বেড়ে যায়। পৃথিবীর আকার যে গোল সে সম্বন্ধে লোকের ধারণা জন্মায়। তারা মনে করে যে ইউরোপ থেকে পশ্চিম বা পূর্বে যে কোন দিকে সোজা সমুদ্র পথে যাত্রা করলে প্রাচ্যের দেশগুলোতে পৌঁছান যায়। এ সময় ইউরোপীয়দের জাহাজ তৈরী করার দক্ষতা বেড়ে যায় এবং নানা নৌ-যন্ত্রপাতিরও আবিষ্কার হয়। 'কম্পাস' বা দিঙ্নির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবন হবার পর সমুদ্রপথে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আর ছিল না। 'অ্যাস্ট্রোলেব' নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় করা সহজ হয়। এ ছাড়া নক্ষত্র-পরিমাপক যন্ত্রেরও উদ্ভাবন হয়। নাবিকদের জন্য মানচিত্র, নক্সা, সমুদ্রের পথ-নির্দেশ তালিকা ইত্যাদিও তৈরী হয়। দাঁড়-টানা নৌকার মত ছোট ছোট জাহাজের পরিবর্তে পালতোলা বড় বড় জাহাজ তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়। এই সব আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের মধ্যে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সাহস জন্মায়।
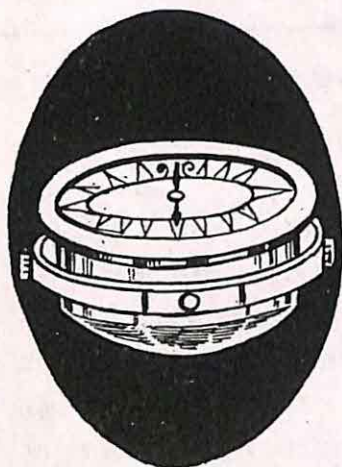
কম্পাস

পর্তুগাল ও স্পেনের সামুদ্রিক অভিযান ঃ সে যুগে জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রাই অগ্রনী হয়। পর্তুগীজদের সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম প্রেরণা দেন পর্তুগালের রাজার ভাই যুবরাজ হেনরী (১৩৯৪-১৪০৭ খ্রীঃ)। তিনি নাবিক-হেনরী নামেও পরিচিত। হেনরী ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান। আফ্রিকার উপকূলবাসী মুসলমানদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা ও আফ্রিকার দক্ষিণ-উপকূল ঘুরে ভারতে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি সাগ্রেস নামে এক জায়গায় নৌ-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সেখানে তিনি দক্ষ ইটালীর নাবিকদের আমন্ত্রণ করেন। হেনরী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেক অজানা অঞ্চল আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

'নাবিক হেনরী'

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বারথেলোমিউ ডিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছান। এখানে তাঁকে এক প্রবল

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সামুদ্রিক অভিযান

ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়তে হয়। এই কারণে তিনি আফ্রিকার এই প্রান্তের নাম রাখেন 'ঝড়ের অন্তরীপ'। কিন্তু পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এই অন্তরীপের নাম রাখেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ', কারণ এতদিনে ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে পৌঁছান যাবে বলে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়।

ডিয়াজ

প্রায় দশ বছর পরে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা নামে পর্তুগালের এক নাবিক ছোট ছোট চার খানা জাহাজ নিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন (১৪৯৮ খ্রীঃ)। ভাস্কো-দা-গামা ভারত থেকে জাহাজ ভর্তি করে মশলা ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলে পর্তুগালের রাজা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

ভাস্কো-দা-গামা

ভাস্কো-দা-গামা

ইউরোপ থেকে ভারতে আসার এই নতুন জলপথের আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভাস্কো-দা-গামার সাফল্যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে পর্তুগীজ নাবিকরা একের পর এক ভারতে আসা শুরু করে, ভারতে কুঠি স্থাপন করে রীতিমত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়।

ভাস্কো-দা-গামা-র সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে কেব্রাল নামে আর এক পর্তুগীজ নাবিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এক শক্তিশালী নৌ-বহর নিয়ে একই জলপথ ধরে ভারতে আসেন। তিনি কালিকটে এক বাণিজ্য কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি কোচিন বন্দরে আসেন এবং সেখানেও বাণিজ্য কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন কোচিনে থাকার পর তিনি জাহাজ ভর্তি করে মশলা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

কেব্রাল

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ নাবিকদের সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে পর্তুগাল সরকার ভারতে স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা চিন্তা

করেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতে পর্তুগীজদের শাসক হিসাবে আলবুকার্ক-কে পাঠান হন। আলবুকার্ক (১৫০৯-১৫ খ্রীঃ) ভারতে পর্তুগীজদের রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হন। তিনি গোয়া দখল করে ভারতে পশ্চিম উপকূলে প্রথম পর্তুগীজ নৌ-ঘাঁটি ও শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলবুকার্ক

পর্তুগীজ নাবিকদের মত স্পেনের নাবিকরাও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে ব্রতী হন। সে সময় কলম্বাস নামে ইটালীর এক নাবিকের ধারণা ছিল যে আতলান্তিক মহাসাগর পার হলেই ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান যাবে। স্পেনের রাজা ও রাণীর সাহায্যে কলম্বাস কয়েকটি ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে যাত্রা করে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছান। কলম্বাস বুঝতে পারেননি যে তিনি আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। জীবনের শেষপর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন। এই দ্বীপপুঞ্জগুলোকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়।

কলম্বাস

কলম্বাস

কলম্বাসের পর বালবোয়া নামে স্পেনের এক নাবিক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে মশলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করে পানামা যোজক পার হয়ে এক নতুন সাগরের সন্ধান পান। এই সাগরের নাম দেওয়া হয় দক্ষিণ-সাগর। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পানামা নগরের প্রতিষ্ঠা হয়।

বালবোয়া

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস বেঁচে থাকতেই আমেরিগো ভেসপুচী নামে ইটালীর এক নাবিক ব্রেজিলে এসে পৌঁছান। তাঁর নাম অনুসারে আতলান্তিক মহাসাগরের ওপারের বিশাল ভূখণ্ডের নাম হয় আমেরিকা। আমেরিগো স্পেনের মহানাবিকের পদ লাভ করেছিলেন।

আমেরিগো ভেসপুচী

স্পেনের রাজার চাকরী গ্রহণ করে ম্যাগেলান নামে এক পর্তুগীজ নাবিক ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচটি জাহাজ নিয়ে মশলা দ্বীপের খোঁজে

বেরিয়ে পড়েন। আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্তে এক সংকীর্ণ প্রণালী (পরে ম্যাগেলানের নাম অনুসারে এর নাম হয় 'ম্যাগেলান প্রণালী') পার হয়ে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েন। আরও পশ্চিমে যাত্রা করে তিনি এক দ্বীপে এসে পৌঁছান। স্পেনের রাজপুত্র ফিলিপের নাম অনুসারে এই দ্বীপের নাম হয় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (১৫২১ খ্রীঃ)। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ম্যাগেলানের সংগীদের কয়েকজন ভারত মহাসাগর পার হয়ে ও আফ্রিকা ঘুরে স্বদেশে ফিরে যান।

ম্যাগেলান

ফলাফল ঃ পৃথিবীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে তিনটি নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই তিনটি নাম হল ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা ও ম্যাগেলান। এঁদের মধ্যে ম্যাগেলান জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে এশিয়ার মশলা দ্বীপপুঞ্জে আসেন—যে মশলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে সকলের নজর তখনও ছিল। জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইতিহাসে এটা এক বিরাট কৃতিত্ব। এশিয়া মহাদেশের আয়তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভূগোলজ্ঞ টলেমীর তত্ত্ব ম্যাগেলান-এর ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ভুল প্রমাণিত হয়।

বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ ও সমুদ্র-পথের আবিষ্কার হলে পৃথিবী যে সত্যিই গোল এবং কলম্বাস যে এক নতুন মহাদেশের সন্ধান পেয়েছিলেন তা প্রমাণিত হয়। ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগে নতুন জগৎ অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আমেরিকা মহাদেশে কয়েকটি সমৃদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়—যেমন মধ্য আমেরিকার 'মায়া' ও 'আজটেক' সভ্যতা এবং দক্ষিণ আমেরিকার 'ইনকা সভ্যতা'।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর থেকে আতলান্তিক মহাসাগরে চলে যায়। ইউরোপের নাবিক ও বণিকেরা বড় বড় মহাসাগর পার হয়ে নতুন আবিষ্কৃত দেশ ও মহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। যেখানেই তারা যায় সেখানেই তারা তাদের জাতীয় পতাকা সংগে নিয়ে যায় ও সেই সংগে যান ধর্মযাজকেরা। সেই সংগে শুরু হয় ইউরোপীয়দের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কারণ এই সব নতুন দেশ ও মহাদেশে ছিল অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। সেই সম্পদ শোষণের প্রতিযোগিতা থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে অগ্রণী হয় স্পেনের আক্রমণকারী নাবিকেরা। এদের বলা হয় 'কনকুইস্‌টেডরস'। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—যেমন কোর্টিস, দিয়াগো-দ্য-আলমাগরো, ফ্রান্সিসকো পিজারো প্রভৃতি। এঁরা রীতিমত যুদ্ধ করে কিউবা, মেক্সিকো, পেরু, চিলি প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপন করেন। এঁরা আমেরিকার স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেন ও স্থানীয় লোকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ চালান। ফলে অগণিত মানুষ চরম দারিদ্রে ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলে ইউরোপের দেশগুলোতে বণিকেরা ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নিজেদের স্বার্থেই এরা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠে। বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এরা নিজেদের রাজাদের সমর্থন প্রার্থনা করে। এর ফলে ইউরোপে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। নবজাগরণের প্রভাবের ফলে ইউরোপের দেশগুলোতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হয়। জাতিগত ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ থেকেই ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। কি কি কারণে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার উৎসাহ দেখা দেয়?

২। আধুনিক যুগের শুরুতে কেন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়?

৩। পর্তুগীজ নাবিকরা কোন্ কোন্ দেশ আবিষ্কার করেন? কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিকের নাম কর।

৪। 'নাবিক হেনরী' সম্বন্ধে কি জান?

৫। কলম্বাস ও ম্যাগেলান কিসের জন্য বিখ্যাত?

৬। 'কনকুইস্‌টেডরস' কাদের বলা হয়? এদের কয়েকজনের নাম কর।

৭। নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল সম্বধে আলোচনা কর।

ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন | চতুর্থ অধ্যায়

কারণ ঃ ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবের ফলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় — যা ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। নবজাগরণের ফলে ইটালীর লোকেদের মন কঠোর ধর্মজীবন ত্যাগ করে পার্থিব সুখ-ভোগের দিকে যায়। তারা বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের লোকেরা ছিল সাধারণতঃ কষ্টসহিষ্ণু, চিন্তাপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ। নবজাগরণের প্রভাবে তাদের চিন্তাশক্তি আরও গভীর হয়ে ওঠে ; গ্রীক ও হিব্রু ভাষার চর্চার ফলে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও ধর্মযাজকদের দুর্নীতি ও ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দোষ-ত্রুটি, পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মগুরু পোপ ও ধর্মযাজকদের ভোগবিলাস ও নৈতিক অধঃপতন লোকের মনে এক দারুণ অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। তারা পোপ ও ধর্মযাজকদের নৈতিক অধঃপতনের ও ক্যাথলিক গির্জার অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে 'ধর্ম-সংস্কার' নামে এক ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন স্বয়ং পোপ থেকে শুরু করে সাধারণ ধর্মযাজক পর্যন্ত সকলেই মানুষকে ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করাকেই বড় বলে মনে করতেন। ধর্মের নামে পোপ খ্রীস্টানদের কাছ থেকে নানা ধরণের কর (যেমন 'টাইথ', 'আনাতস') আদায় করতেন। নানা দেশ থেকে যে অর্থ রোমের ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানে আসতো, তা পোপ ও যাজকদের বিলাস ব্যসনেই শেষ হয়ে যেত। তবুও পোপ ও যাজকদের অর্থের চাহিদা মিটত না। এমন কি নানা মানুষের ওপর নানা কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হত। এই অবস্থায় পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের চিন্তাশীলগণ ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন।

সংস্কার আন্দোলন ঃ ধর্মগুরু পোপ ও ক্যাথলিক গির্জার ওপর প্রথম আঘাত আসে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর চিন্তশীল পন্ডিতদের কাছ থেকে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দুঃসাহসিক

সংস্কারপন্থী অধ্যাপক জন ওয়াইক্লিফ (১৩২৪-৮৪ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম পোপ ও গির্জার রীতিনীতি ও ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করেন। ওয়াইক্লিফ-কে সংস্কারের শুকতারা (**Morning star of the Reformation**) বলা হয়। তিনি প্রথমেই যাজকদের নৈতিক অধঃপতনের ও ক্যাথলিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি দাবি করেন যে ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার পোপ তথা গির্জার নেই। তিনি পোপের অর্থের লোভ, পোপের প্রাসাদের দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর আক্রমনের

জন ওয়াইক্লিফ

প্রধান লক্ষ্য ছিল যাজকদের রাষ্ট্রের চাকরী গ্রহণ, তাদের ভোগ-বিলাস ও নৈতিক অধঃপতন। তিনি সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন যাতে সাধারণ মানুষ নিজেরাই ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে পারে এবং এর জন্য যাজকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়। তিনি এই ভাবে সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচার করেন যে একমাত্র সং ও পবিত্র মানুষই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। এই কারণে তিনি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ যাজক ও পোপদের অবজ্ঞা করার পরামর্শ সকলকে দেন। নিজের মতবাদ প্রচার করার জন্য ওয়াইক্লিফ কিছু গরীব সং লোকেদের নিয়ে এক সংস্থা গঠন করেন। এদের বলা হত 'লোলার্ড'। প্রকৃতপক্ষে ওয়াইক্লিফ-এর সময় থেকে ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়।

জার্মানীর অন্তর্গত বোহেমিয়ার এক যাজক জন হাস্ (১৩৭৩-১৪১৫ খ্রীঃ) মধ্য ইউরোপের সব দেশে জন ওয়াইক্লিফ-এর মতবাদ প্রচার করেন। হাস্ ছিলেন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। তিনি ওয়াইক্লিফ-এর মত ধর্মতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ক্যাথলিক গির্জার দুর্নীতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করার

জনহাস্

অপরাধে হাসকে বিধর্মী বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। হাস-এর অনুগামীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়। জার্মানীতে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন জন হাস্।

ক্যাথলিক গির্জার সংগে খ্রীষ্টান ধর্মীদের এক বিরাট অংশের বিচ্ছেদ ঘটে জার্মানীতে। ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম নায়ক ছিলেন মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ)। মার্টিন লুথার উত্তর

জার্মানীর ইসিলবেন গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধাণ প্রতিভাবান। এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে শিক্ষালাভ করে তিনি মঠে যোগ দেন এবং পরে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যাথলিক ধর্মের কেন্দ্র রোম পরিদর্শন করেন। সেখানে গির্জা ও ধর্মযাজকদের অনাচার ও দুর্নীতি দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং এই দুর্নীতি থেকে ধর্মকে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সময় রোমে সেণ্টপিটার্স গির্জা তৈরী করার কাজ শুরু হয়। এর জন্য অর্থের দরকার হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ-এর প্রতিনিধিরা জার্মানীতে আসেন পোপের 'মার্জনা-পত্র' (ইনডালজেন্স) বিক্রী করার জন্য। লুথার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি 'মার্জনাপত্রের' বিরুদ্ধে ল্যাটিন ভাষায় পঁচানব্বইটি নিবন্ধ রচনা করে উইটেনবার্গ গির্জায় প্রচার করেন। তিনি সকলের কাছে এই কথাই প্রচার করেন যে অনুতাপই হল মানুষের কৃত-পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত, পোপের মার্জনাপত্র কিনে পাপ মোচন করা যায় না। তিনি একথাও বলেন যে ধর্মের ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। বাইবেল পড়লেই ধর্মের কথা জানা যায়। এর জন্য পোপের অধীনতা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। লুথারের এই সব প্রচার জার্মানীতে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। পোপ তথা ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদ থেকেই ইউরোপে প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদী ধর্মমতের উৎপত্তি হয়।

মার্টিন লুথার

মার্টিন লুথার

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে লুথার একখানি পুস্তিকা (নাম—'ব্যাবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি') প্রকাশ করে পোপের ধর্মগুরুর পদের অধিকার অস্বীকার করেন; ঈশ্বর যাজকদের নিযুক্ত করেন একথাও তিনি অস্বীকার করেন এবং ধর্মের অনুষ্ঠানে যাজকদের প্রাধান্যও অস্বীকার করেন। পোপের

বিরুদ্ধে এইসব কথা বলার অপরাধে পোপ লুথারকে 'পতিত' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু লুথার কিছুমাত্র ভয় পেলেন না। বরং তাঁর যুক্তি ও বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই তাঁর নতুন মতবাদ গ্রহণ করেন। লুথারের মতবাদ ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। পোপ দশম লিও ও পবিত্র রোম সম্রাট পঞ্চমচার্লস-লুথারকে 'পতিত' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু লুথার তা অগ্রাহ্য করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মজগতের ঐক্য—এক ধর্মগুরু পোপ, উপাসনার এক ভাষা, একই ধরণের আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম-সংস্কার অন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টানজগৎ দু'টি দলে ভাগ হয়ে যায়—প্রাচীনপন্থীরা রোমান ক্যাথলিক থেকে যায় এবং লুথারের অনুগামীরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট নামে পরিচিত হয়। জার্মানীতে বহু মঠ ধ্বংস করা হয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাজকদের বিশেষ অধিকার অস্বীকার করা হয় এবং যাজকদের বিয়ে করে গৃহীর জীবন যাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়। লুথারের প্রতিষ্ঠিত গির্জা প্রতিবাদী-গির্জা নামে পরিচিত হয়। হেস, নিউরেমবার্গ ও অগসবার্গ রাজ্যের রাজারা লুথারবাদ গ্রহণ করে নিজেদের রাজ্যে প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট গির্জার প্রতিষ্ঠা করেন।

জার্মানী থেকে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন ক্রমেই ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব দেশে জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজাদের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় গির্জার প্রতিষ্ঠা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে ক্যালভিন নামে এক পণ্ডিত পোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। তিনি জাতিতে ছিলেন ফরাসী কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর। লুথারবাদের সংগে ক্যালভিনবাদের কিছু পার্থক্য থাকলেও ক্যালভিনপন্থীরা ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট পন্থী। ক্যালভিনবাদের মূল কথাই ছিল সুশৃংখল মানবজীবন গড়ে তোলা। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর আমলে (১৫০৯-৪৭ খ্রীঃ) পোপের বিরুদ্ধে জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসাবেই সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম দিকে হেনরী পোপের খুবই অনুগত ছিলেন ও পোপের কাছ থেকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধিও পেয়েছিলেন।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনের প্রসার

হেনরী তাঁর পত্নী ক্যাথারিণকে ত্যাগ করে অ্যানবোলীন নামে এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পোপ, অষ্টম হেনরীকে অনুমতি না দেওয়ায়, হেনরী পার্লামেণ্টের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ করেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক বিশেষ আইনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের গির্জার প্রধান হলেন রাজা নিজেই। পরে অষ্টম হেনরীর কন্যা রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় ইংল্যাণ্ডে ধর্মবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা রোমান ক্যাথলিক ও গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করে একটা পথ বেছে নেয়। ইংল্যাণ্ডে ক্যালভিন পন্থীদের বলা হত 'পিউরিটান' বা পবিত্রতাবাদী। এঁরাই ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট।

প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথমদিকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট গির্জার প্রতিষ্ঠা হলে স্কটল্যাণ্ডেও এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। ইংল্যাণ্ডের মত স্কটল্যাণ্ডের পক্ষেও ক্যাথলিক রাষ্ট্র স্পেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে বিপদের আশংকা ছিল। সে সময় স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী ছিলেন ক্যাথলিক। স্কটল্যাণ্ডে ক্যালভিনবাদী সংস্কার আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে মেরী-স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। ফলে স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার ক্যালভিনপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের 'প্রেসবিটেরিয়ান' বলা হত।

ক্যাথলিক গির্জার সংস্কার আন্দোলন

প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের সাফল্যে ক্যাথলিক গির্জার নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা ক্যাথলিক ধর্মমতের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। ক্যাথলিকদের এই সংস্কারমূলক প্রয়াসকে ক্যাথলিক-সংস্কার বা প্রতি-সংস্কার বলা হয়। স্পেনে—যেখানে তখন প্রোটেস্ট্যাণ্ট বলে কেউ ছিল না, ইগনাটিয়াসলয়োলা নামে এক সৈনিক 'যীশুখ্রীষ্টের সৈনিক' ('Soldiers of Jesus') হিসাবে গির্জার সেবায় ব্রতী থাকার জন্য যাজকদের নিয়ে এক সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার সদস্যরা 'জেসুইট' নামে পরিচিত হয়। জেসুইটদের লক্ষ্য ছিল ক্যাথলিক গির্জার সংস্কার করে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের আবার ক্যাথলিক গির্জায় ফিরিয়ে আনা। প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের প্রসার বন্ধ করার ব্যাপারে জেসুইটদের উৎসাহের ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। পোপ জেসুইটদের সমর্থন করে যান।

ক্যাথলিক গির্জার প্রয়োজনীয় সংস্কার, যাজকদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও ক্যাথলিক ধর্ম-বিরোধী সব রকমের প্রচার বন্ধ করার জন্য 'ইনকুইজিশন' বা পবিত্র ধর্ম-আদালত নতুন করে গঠন করা হয়। এই পবিত্র আদালতের কাজ ছিল ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্ম-বিরোধী কাজকর্মের খোঁজখবর নিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়া। ধর্ম-বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগে অনেককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় এবং অনেককে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পবিত্র আদালত এক নির্যাতনমূলক সংস্থায় পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ইটালীতে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের আনাগোনা শুরু হলে পোপ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সংগে এক আপোষ-মীমাংসা করার জন্য তিনি ট্রেণ্ট নগরে সব খ্রীস্টানদের এক সভা ডাকেন যা 'কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট' বা 'ট্রেণ্ট-সভা' নামে পরিচিত। ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার কাজ চলে। জেসুইটদের সংগে প্রোটেস্ট্যাণ্টরাও সভায় যোগ দেয়। এই সভায় সাধারণভাবে গির্জার আদর্শ ও ধর্মের তত্ত্ব স্থির করা হয় ও ধর্মের ব্যাপারে পোপের নির্দেশ চরম বলে স্বীকার করা হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়, যেমন একটির বেশী যাজকপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়, যাজকদের উপযুক্ত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রতিটি বিশপের এলাকায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন করা বাধ্যতা-মূলক হয়।

পবিত্র আদালত

ট্রেণ্ট সভা

জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধ

ধর্ম সংস্কারের প্রভাবে খ্রীস্টান সম্প্রদায় দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ইউরোপের অনেক দেশে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। মার্টিন লুথারের মৃত্যুর পর জার্মানীতে এই রকমের এক ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় (১৫৪৬-১৫৫৫ খ্রীঃ)। জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজারা একটি লীগ বা সংঘ গঠন করে ফ্রান্সের সংগে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই অবস্থায় জার্মানীর পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের ক্যাথলিক সম্রাট পঞ্চম চার্লস বিচলিত হয়ে পড়েন। লুথারপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দমন করার জন্য তিনি লীগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্যাক্সনী ও হেস-এর শাসকদের আক্রমণ করে তাঁদের পরাস্ত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানীতে ধর্ম-সমস্যার সমাধান হল না। প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজারা এক হয়ে পঞ্চম চার্লস-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধরলে পঞ্চম চার্লস তাঁদের দমন করার আশা ত্যাগ করেন। শেষে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের এক শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয় যা 'অগসবার্গ-এর শান্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে জার্মানীতে লুথারবাদ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়, জার্মানীর প্রতিটি রাজ্যের রাজা ধর্ম-ব্যবস্থার প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি পান এবং রাজার ধর্মই প্রজাদের ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়।

অগস্‌বার্গ-এর শান্তিচুক্তি

দ্বিতীয় ফিলিপ-এর প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিরোধী নীতি ঃ সম্রাট পঞ্চম চার্লস জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দমন করতে বা লুথারবাদ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে বসেন। স্পেন ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় নেদারল্যাণ্ডও পঞ্চম চার্লস-এর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেদারল্যাণ্ড-এর উত্তরাঞ্চলকে বলা হয় হল্যাণ্ড ও দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় বেলজিয়াম। পঞ্চম চার্লস-এর আমলেই হল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত, বিশেষ করে ক্যালভিনবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এদের দমন করতে পঞ্চম চার্লস ব্যর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ফিলিপও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিধর্মী বলে মনে করতেন। এই কারণে তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হন। সে সময় ফ্রান্সের সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডবাসীদের ওপর করের বোঝা বাড়িয়ে দেন যা তখন খুবই বেশী ছিল। অথচ এই কর স্পেনের স্বার্থেই নিয়োজিত করা হচ্ছিল। এ ছাড়া তিনি স্পেনের বণিকদের স্বার্থে নেদারল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করেন। তিনি স্পেনের মত নেদারল্যাণ্ডেও স্বৈরাচারী শাসন চালাবার চেষ্টা করলে নেদারল্যাণ্ডের লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কারণ তারা এত দিন ধরে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভোগ করে আসছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নেদারল্যাণ্ডের লোকেরা ক্রমেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর পর ফিলিপ সেখানকার ক্যাথলিক ধর্ম-বিরোধীদের ধ্বংস করতে উদ্যোগী হলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই সেখানে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ফিলিপ এক স্পেনীয় বাহিনী নেদারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ধ্বংস করার চেষ্টা করলে

দ্বিতীয় ফিলিপ ও নেদারল্যাণ্ড

নেদারল্যাণ্ডবাসীরা বিদ্রোহী হয়। তাদের নেতা ছিলেন নেদারল্যাণ্ডের 'অরেঞ্জ' নামে এক সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী অভিজাত পরিবারের যুবরাজ উইলিয়াম। প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা অনেক ক্যাথলিক গির্জা ও মঠ ধ্বংস করে। এই বিদ্রোহের সময় নেদারল্যাণ্ড দুভাগে ভাগ হয়ে যায়—দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডে স্পেনের শাসন ও ক্যাথলিক গির্জার আবার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু উত্তর নেদারল্যাণ্ডের ছোট ছোট সব প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে উইলিয়ামের নেতৃত্বে হল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড পরে বেলজিয়াম নামে পরিচিত হয় ও সেখানে ক্যাথলিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নেদারল্যাণ্ডের ব্যাপারে পুরোপুরি সফল না হলেও দ্বিতীয় ফিলিপ প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ধ্বংস করার নীতি চালিয়ে যান। নেদাল্যাণ্ডের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ে ইংল্যাণ্ডের ওপর। ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কারনে স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ নিজেকে ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষক বলে মনে করতেন। এই কারণে ইংল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত ধ্বংস করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে ইংল্যাণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব করার সংকল্পও তিনি গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ড সে সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল। নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহে ইংল্যাণ্ড সমর্থন করেছিল ও তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। এইসব কারণে দ্বিতীয় ফিলিপ, রাণী প্রথম এলিজাবেথ তথা ইংল্যাণ্ডের ওপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন। ধর্মের সংঘাত ছাড়াও, সে সময় আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও এই দু'দেশের মধ্যে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই দু'দেশের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ ঘটে নি। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের পলাতকা ক্যাথলিক রাণী মেরীকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে রাণী প্রথম এলিজাবেথ প্রাণদণ্ড দিলে দ্বিতীয় ফিলিপের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাঁর আশা ছিল যে রাণী মেরী এলিজাবেথকে সরিয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করলে সেখানে ক্যাথলিকবাদের জয় সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু রাণী মেরীর প্রাণদণ্ড হলে দ্বিতীয় ফিলিপের সব আশা-আকাংখা নস্যাৎ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ফিলিপ ও ইংল্যাণ্ড

এই অবস্থায় সরাসরি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা ছাড়া দ্বিতীয় ফিলিপের আর কোন উপায় রইল না। তিনি এক বিরাট **নৌ-বহর** গঠন করেন। স্পেনের এই নৌ-বহরকে বলা হয় 'আর্মাডা'। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেনের আর্মাডা স্পেন থেকে যাত্রা করে। স্পেনের নৌ-সেনাধ্যক্ষ ছিলেন মেডিনা সিডোনিয়া। ইংরাজ নৌ-বহরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন লর্ড হাওয়ার্ড। আর্মাডা ইংলিশ প্রণালীর ওপর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রথমদিকে ইংরাজরা আর্মাডার অগ্রগতিতে কোন রকম বাধা দিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে স্পেনের ছোট ছোট জাহাজগুলো প্রধান নৌ-বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সেই মুহূর্তে ইংরাজ জাহাজগুলো ওদের ওপর আক্রমণ চালায় ও অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। বিপর্যয় দেখে আর্মাডা ক্যালে বন্দরে আশ্রয় নেয়। শেষে গ্রেভলাইন-এর যুদ্ধে আর্মাডা পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। আর্মাডার বেশীর ভাগ জাহাজ ধ্বংস হয়। মাত্র কয়েকটি জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। আর্মাডার পরাজয়ের ফলে রাণী প্রথম এলিজাবেথ ক্যাথলিকদের বিপদ থেকে মুক্ত হলেন, ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদ রক্ষা পেল এবং ইংল্যাণ্ডের বাইরে ক্যাথলিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হল।

স্পেনীয় নৌ-বহর আর্মাডা

অনুশীলনী

১। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মসংস্কার বলতে কি বোঝায়? এই সংস্কারের প্রয়োজন কেন হয়েছিল?

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণ কি? কোন্ দেশে এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয়?

৩। জন ওয়াইক্লিফ্, জন হাস্ ও মার্টিন লুথার সম্বন্ধে কি জান?

৪। জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কোন্ চুক্তির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়?

৫। ইংল্যাণ্ডের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

৬। নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কারণ কি? এর ফল কি হয়েছিল?

৭। দ্বিতীয় ফিলিপের ইংল্যাণ্ড আক্রমণের কারণ কি ছিল? আর্মাডার পরাজয়ের ফল কি হয়েছিল?

বিপ্লবের পট ভূমিকা

ষোড়শ শতকে টিউডর রাজাদের আমলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই যুগেই নবজাগরণের প্রভাব ইংল্যাণ্ডের চিন্তাজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে; ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইংল্যাণ্ডবাসীদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হতে থাকে। এই সব ঘটনার ফলে ইংল্যাণ্ডে এক সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ছোট ছোট জমিদার, বণিক, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোকেরা। এতদিন পর্যন্ত রাজা ও অভিজাত লোকেরাই সব রকমের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দেশ শাসনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ক্রমেই উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অনেকদিন ধরে সংগ্রাম ও আন্দোলন করার পর তাঁরা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এটাই হল সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-বিপ্লব।

টিউডর রাজা ও রাণীরা শুধু যে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন তাই নয়, তাঁরা ছিলেন সুশাসক ও প্রজাকল্যাণকামী। রাণী প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তাঁর আমলকে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় যুগ বলা হয়। সে সময় ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে বিরোধ, ইংল্যাণ্ডের ওপর বিদেশী শত্রুর আক্রমণ (স্পেনীয় আর্মাডা) প্রভৃতি কারণে সেখানে এক জাতীয় সংকট চলছিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বুঝতে পারে যে, এই জাতীয় সংকটের সময় রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে দেশের সমূহ বিপদ ঘটবে। কিন্তু ধর্মবিরোধ মিটে গেলে এবং স্পেনীয় আর্মাডা পরাস্ত হলে ইংল্যাণ্ডের জনগণের কাছে স্বেচ্ছাচারী শাসনের আর প্রয়োজন থাকল না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে তারা নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে।

এলিজাবেথের পর (১৬০৩ খ্রীঃ) স্কটল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম জেমস্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন বিদেশী। ইংল্যাণ্ডের রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারতেন না। বিদেশী বলে ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও স্টুয়ার্ট রাজাদের সন্দেহের চোখে দেখত। সে সময় ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য ছিল। তারা স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ বেধে যায়।

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণ

স্টুয়ার্ট রাজারা (প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস) বিশ্বাস করতেন যে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলেই রাজা দেশ শাসন করেন। সুতরাং তাঁদের রাজকার্যের সমালোচনা করার অধিকার প্রজাদের নেই। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজাদের এই দাবি মেনে নিতে অসম্মত হলে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়।

বহুদিন থেকেই কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিল পার্লামেণ্টের। কিন্তু প্রথম জেমস্ (১৬০৩-২৫ খ্রীঃ) ও প্রথম চার্লস (১৬২৫-৪৯ খ্রীঃ) পার্লামেণ্টের এই অধিকার অগ্রাহ্য করে কর ধার্য করতেন এবং কখনও কখনও ধনীদের কাছ থেকে জোর করে ঋণ আদায় করতেন। কেউ বাধা দিলে তাকে বিনা বিচারে বন্দী করা হত। পার্লামেণ্ট এই অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে। এ ছাড়া স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেণ্ট না ডেকেই দেশ শাসন করতেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরা মনে করতেন যে, রাজা পার্লামেণ্ট না ডেকে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলে।

ধর্মের কারণেও রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। সে সময় ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা দুটো প্রধান দলে বিভক্ত ছিল—যারা এলিজাবেথের ধর্ম-মীমাংসা মেনে চলত তাদের বলা হত অ্যাংলিকান ও যারা গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদী ছিল তাদের বলা হত পিউরিটান। পার্লামেণ্টে পিউরিটানরাই ছিল সংখ্যায় বেশী। প্রথম জেমস ছিলেন পিউরিটানদের ঘোর বিরোধী। প্রথম চার্লস ক্যাথলিকদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ দেখালে পিউরিটানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়।

প্রথম চার্লসের রাজত্বের প্রথম দিকে পার্লামেণ্ট রাজার কাছে এক অধিকারের আবেদন পেশ করে। এতে রাজাকে জানান হয় যে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া তিনি কর বসাবেন না, ঋণ গ্রহণ করবেন না এবং শান্তির সময় সামরিক আইন জারী করবেন না। অর্থের প্রয়োজনে চার্লস এই

সব দাবি মেনে নেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট আরও কিছু দাবি করলে চার্লস পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে স্বৈরতন্ত্র শুরু করেন এবং প্রায় এগারো বছর এই শাসন চালিয়ে যান। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লসের ধর্মনীতির ফলে স্কটল্যাণ্ডের গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য অর্থ সংগ্রহের আর কোন উপায় না দেখে চার্লস পার্লামেণ্ট ডাকতে বাধ্য হন। পার্লামেণ্ট নানাভাবে রাজার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আইন পাশ করে। পার্লামেণ্ট রাজার কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করলে চার্লস পার্লামেণ্টের পাঁচজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতা চার্লসকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং তিনি সৈন্য সমাবেশ করলে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেধে যায়।

গৃহযুদ্ধ

এইভাবে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ও তা চার বছর ধরে চলে। রাজার পক্ষে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়, আর পার্লামেণ্টের পক্ষে ছিলেন ছোট ছোট জমিদার ও বণিক সম্প্রদায়। পার্লামেণ্টের অনুকূলে অলিভার ক্রমওয়েল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনীকে বলা হত 'আদর্শ বাহিনী' (Model Army)। প্রথমদিকে রাজারই জয় হয়। কিন্তু অলিভার ক্রমওয়েলের রণনৈপুণ্য ও নির্ভিকতার ফলে শেষ পর্যন্ত চার্লস পরাস্ত হন ও বন্দী হন। পার্লামেণ্ট চার্লসের বিচার করে তাঁর শিরচ্ছেদ করে (১৬৪৯ খ্রীঃ)।

ক্রমওয়েল ও সাধারণতন্ত্র ঃ চার্লসের প্রাণদণ্ডের পর রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে কমনওয়েলথ বা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক নতুন প্রশাসন বিধি রচনা করে অলিভার ক্রমওয়েলকে 'লর্ড প্রোটেক্টর' বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্রমওয়েলও পার্লামেণ্টকে মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। ১৬৫৩ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেনাপতিদের সাহায্য নিয়েই দেশ শাসন করেন। তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসন দক্ষতা বিশেষ ছিল না। সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নায়ক হয়েও তিনি পূর্বেকার রাজাদের তুলনায় অনেক বেশী স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁর আমলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। তাঁর সামরিক কর্মচারীদের অত্যাচারে মানুষ ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ডের মানুষ এটাই ভাবতে শুরু করল যে সাধারণতন্ত্রের শাসন অপেক্ষা পূর্বের শাসনব্যবস্থাই ভাল ছিল।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়। এর দু'বছর পরে (১৬৬০ খ্রীঃ) ইংল্যাণ্ডের মানুষ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পার্লামেণ্ট প্রথম চার্লসের নির্বাসিত পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ করে। আবার ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সঙ্গে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা হয়। রাজতন্ত্রের জয় হল বটে, কিন্তু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের চির অবসান হল। এরপর থেকে ইংল্যাণ্ডের কোন রাজার পক্ষেই পার্লামেণ্ট তথা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশীদিন রাজত্ব করা সম্ভব হয় নি।

গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ)

পিতা ও পিতামহের মত দ্বিতীয় চার্লসও মনে-প্রাণে ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী ও ক্যাথলিক মনোভাবাপন্ন। রাজত্বের শেষের দিকে পার্লামেণ্টের সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের মত বিরোধ দেখা দেয় তাঁর ক্যাথলিক প্রীতির জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পার্লামেণ্টের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখে চলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয় রাজা।

১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন। দ্বিতীয় জেমস স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী ও গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি ক্যাথলিকদের নানাভাবে অনুগ্রহ দেখাতে শুরু করেন ও সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন চালাতে শুরু করেন। তিনি একের পর এক রাজ-আদেশ জারী করে ক্যাথলিকদের ওপর থেকে সব রকমের বিধি-নিষেধ তুলে নেন। লণ্ডনের নাগরিকদের ভয়ে সন্ত্রস্ত রাখার জন্য একদল ক্যাথলিক আইরিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। দ্বিতীয় জেমসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ইংল্যাণ্ডের মানুষের আশা ছিল যে দ্বিতীয় জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা ও হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়কের পত্নী মেরী সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু ঠিক এই সময় জেমসের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলে ইংল্যাণ্ডের মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা এই আশঙ্কাই করল যে জেমসের পর আবার একজন ক্যাথলিক রাজা হবেন। এই অবস্থায় দেশের নেতারা মেরীর স্বামী হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়ামকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। উইলিয়াম সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে আসেন। দ্বিতীয় জেমস

তাঁকে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা না করেই ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পার্লামেণ্টের অনুরোধে উইলিয়াম ও মেরী সিংহাসনে বসেন (১৬৮৮ খ্রীঃ)।

বিনা রক্তপাতে এত বড় রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটেছিল বলে একে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয়। স্টুয়ার্ট রাজাদের আমল থেকেই রাজার ক্ষমতা ও পার্লামেণ্টের অধিকার নিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে তার চরম মীমাংসা হয়ে যায়। পার্লামেণ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সুস্পষ্ট করার জন্য ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বিল-অফ-রাইটস্' বা অধিকারের বিধি নামে এক আইন পাশ করা হয়। এই আইনে বলা হয় যে পার্লামেণ্টের নির্বাচন হবে অবাধ, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী হতে হবে; পার্লামেণ্টের অধিবেশন ঘন ঘন ডাকতে হবে; পার্লামেণ্টের সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়া রাজা কর ধার্য করতে ও স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখতে পারবেন না।

ফলাফল

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে সাংবিধানিক যুগের সূচনা হয়। ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদের জয় হয় এবং ইউরোপের রাজনীতিতে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় মর্যাদা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। টিউডর যুগে ইংল্যাণ্ডে কি কি পরিবর্তন আসে?
২। টিউডর রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার কারণ কি?
৩। ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতকের বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? পার্লামেণ্ট ও স্টুয়ার্ট রাজাদের মধ্যে বিবাদের কারণ কি ছিল?
৪। ইংল্যাণ্ডে কিভাবে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়? এর ফলাফল কি হয়?
৫। ক্রমওয়েল ও সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে কি জান?
৬। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের কারণ কি? একে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয় কেন? এই বিপ্লবের ফল কি হয়?
৭। 'বিল-অফ-রাইটস্' বা অধিকারের আইন সম্বন্ধে কি জান?

(১) মুঘল সাম্রাজ্য

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)

মুঘলদের পরিচয়

'মোংগ' শব্দ থেকে 'মোংগল' শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ হল নির্ভীক। আবার 'মোংগল' শব্দ থেকে 'মোগল' বা মুঘল শব্দটির উৎপত্তি। মধ্য এশিয়ায় মুঘলরা চাখতাই-তুর্কী নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে এরা মোগল বা মুঘল নামেই পরিচিত।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন **জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর**। তাঁর পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন দুর্ধর্ষ তৈমুরলংগের বংশধর ও মাতা ছিলেন মোংগল বীর চেংগিজ খাঁর বংশজাত। ওমর শেখ ছিলেন ফারগানা নামে এক অঞ্চলের অধিপতি।

১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে কাবুল দখল করেন। এরপরেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে ভারতের ওপর। সে সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন আফগান বংশীয় ইব্রাহিম লোদী। দিল্লীর আফগান অভিজাতরা ইব্রাহিম লোদীকে পছন্দ করতেন না। তাঁদের কয়েকজন বাবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ-জানান। বাবর ভারত বিজয় করার এক অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি দেরী না করে ভারত আক্রমণ করেন এবং ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কাছে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে নিহত করেন। এই সাফল্যের ফলে দিল্লী ও আগ্রা বাবরের দখলে আসে, আফগান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর বাবর খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাজপুত রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাস্ত করেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। দু' বছর পর তিনি ঘর্ঘরার যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৫৩০ খ্রীঃ)।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র **হুমায়ুন** মুঘল সিংহাসনে বসেন এবং প্রথম দফায় তিনি ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হুমায়ুন একদিকে ছিলেন দয়াপ্রবণ, নির্ভীক ও বীর; অন্যদিকে তাঁর চরিত্রে অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার খুবই অভাব ছিল। প্রথমেই হুমায়ুনকে একদিকে শেরখাঁর নেতৃত্বে বিহারের আফগান সর্দারদের

মোকাবিলা করতে হয়। অন্যদিকে গুজরাটের বাহাদুর শাহ রাজ্য-বিস্তার শুরু করেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পরাস্ত করেন। এরপর তিনি বিহারের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বিহারের আফগান নেতা শের খাঁ ছিলেন সাসারামের জায়গীরদারের পুত্র। তিনি শক্তি সঞ্চয় করে চুনার ও **রোটাস** দুর্গ দখল করেন। বিহারে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাস্ত হন। শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন পারস্যে চলে যান। কিছুদিন পরে পারস্যের সম্রাটের সাহায্য নিয়ে হুমায়ুন কাবুল ও কান্দাহার দখল করেন। এই সময় শের শাহের মৃত্যু হলে আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। হুমায়ুন আফগানদের পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। এইভাবে তিনি আবার মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। পরের বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **আকবর** মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। তিনি ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আকবরকে এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর সুযোগে শের শাহের এক উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু দিল্লী ও আগ্রা জয় করেছিলেন। তখন আকবর ছিলেন পাঞ্জাবে। তাঁর অভিভাবক ছিলেন হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খাঁ। সময় নষ্ট না করে আকবর ও বৈরাম খাঁ হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন। আকবর বৈরাম খাঁর সাহায্যে দিল্লী দখল করেন।

আকবরের আমলে রাজ্য বিস্তার

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করে আকবর রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। একে একে গোয়ালিয়র, আজমীর, **জৌনপুর** ও **মালব** তাঁর দখলে আসে। সে সময় ভারতে রাজপুতরাই ছিল শৌর্যে বীর্যে সকলের সেরা। আকবর স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সহযোগিতা ছাড়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি রাজপুত কন্যা বিয়ে করে রাজপুতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রাজপুত রাজাদের মধ্যে অম্বরের রাজপুত্র মানসিংহ মুঘল সেনাবাহিনীতে মর্যাদাপূর্ণ পদলাভ করেন। কিন্তু রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ শক্তি মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হল না। কাজেই আকবর মেবার আক্রমণ করেন (১৫৬৭ খ্রীঃ) ও রাজধানী চিতোর দখল করেন। মেবারের

রাণা উদয়সিংহ পালিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যে উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সে সময় রাণা প্রতাপ ছিলেন রাজপুত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সুনিপুণ যোদ্ধা ও তাঁর দেশপ্রেম ছিল গভীর। হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীঃ) রাণা প্রতাপ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাস্ত হন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে। এরপর আকবর পশ্চিমে গুজরাট থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেন। ক্রমে কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তর-ভারত বিজয় সম্পন্ন করে আকবর দক্ষিণ-ভারত বিজয়ে যত্নবান হন। সেসময় দক্ষিণ-ভারতে চারটি মুসলমান রাজ্য ছিল; যথা—আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও খান্দেশ। খান্দেশের সুলতান বিনা যুদ্ধেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু অপর তিন সুলতান তা না করায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান হয় (১৫৯৫ খ্রীঃ)। শেষ পর্যন্ত মুঘলরা আহম্মদনগর জয় করে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের অসীর গড় দুর্গটি মোগলদের দখলে চলে যায়। অসীর গড় আকবরের শেষ রাজ্য জয়।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম, **জাহাংগীর** নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। পিতার মত তিনিও রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই মেবারের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। মেবারের রাণা অমরসিংহ পরাস্ত হয়ে সন্ধি করেন। এর পর বাংলার স্বাধীন জমিদারদের (এঁরা সাধারণ ভাবে 'ভুঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন) বিরুদ্ধে মুঘল অভিযান পাঠান হয়। একে একে বাংলার জমিদাররা পরাস্ত হলে সেখানে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-ভারতে আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানরা সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে রাজী হন।

জাহাংগীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র **শাহজাহান** সম্রাট হন (১৬২৭ খ্রীঃ)। তিনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পিতা ও পিতামহের মত শাহজাহানও রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হলে তাঁর বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী পাঠান হয়। বিজাপুরের সুলতান পরাস্ত হয়ে মুঘল বশ্যতা স্বীকার

মহম্মদ বাবর

হুমায়ুন

আকবর

জাহাঙ্গীর

শাহজাহান

ঔরঙ্গজেব

মুঘল সাম্রাজ্য
(১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ)
পামীর মালভূমি
হিন্দুকুশ
কাশ্মীর
গজনী
পেশোয়ার
লাহোর
কান্দাহার
অমৃতসর
মুলতান
সিন্ধু নদ
পাণিপথ
বিকানির
দিল্লী
আজমীর
অমরকোট
যোধপুর
সিন্ধু
গোয়ালিয়ার
এলাহাবাদ
কাশী
পাটনা
রাজমহল
গৌড়
বিহার
আসাম
ঢাকা
হিমালয় পর্বতমালা
ব্রহ্মপুত্র নদ
চিতোর
মালব
মেবার
উজ্জয়িনী
আমেদাবাদ
নর্মদা নং
চন্দননগর
কলিকাতা
গুজরাট
খান্দেশ
গণ্ডোয়ানা
চট্টগ্রাম
দিউ
সুরাট
বেরার
কটক
বোম্বাই
আহম্মদনগর
বঙ্গোপসাগর
সাতারা
গোলকুণ্ডা
মুছলিপত্তনম
বিজাপুর
আরবসাগর
গোয়া
মাদ্রাজ
জেলোর
পণ্ডিচেরী
কাবেরী
ব্যাঙ্গালোর
তাঞ্জোর
কালিকট
মাদুরা
সিংহল
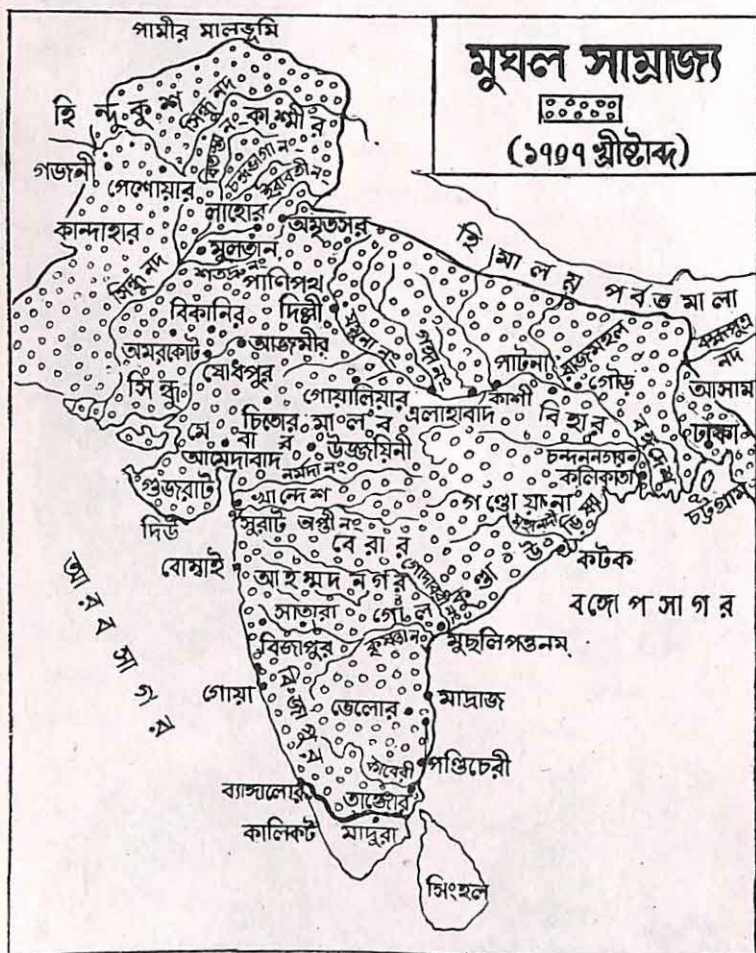
করেন। আহম্মদনগর বিজয় সম্পন্ন করা হয় ও তা মুঘল সাম্রাজ্যের অংগীভূত হয়। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরংগজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

শাহজাহানের শেষ জীবন ছিল দুঃখময়। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্র (দারা, সুজা, ঔরংগজেব ও মুরাদ) সিংহাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু ঔরংগজেব অন্য সব ভাইকে পরাস্ত করে আগ্রায় এসে সিংহাসন দখল করেন। বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করে **ঔরংগজেব 'আলমগীর'** উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। তিনি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সিংহাসনে বসেই ঔরংগজেব রাজ্য বিস্তারে যত্নবান হন। তাঁর সেনাপতি ও বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আসাম রাজ্য আক্রমণ করে কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। সেখানকার মগেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়। সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামের নতুন নাম রাখেন ইসলামাবাদ।

ঔরংগজেব দক্ষিণ-ভারতেও রাজ্যবিস্তারে যত্নবান হন। সেসময় সেখানে দুটি সিয়া রাজ্য ছিল যথা—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। মুঘল বাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় (১৬৮৬ খ্রীঃ)। এরপর মুঘল বাহিনী গোলকুণ্ডা আক্রমণ করে তা'ও দখল করে নেয়।

মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

বাবর ও জাহাংগীরের আত্মচরিত; আবুল ফজল, বদাউনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের রচনা ও ইউরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বিবরণ থেকে মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়। সে যুগে ভারতে ইউরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা যাঁরা এসেছিলেন এবং ভারত সম্বন্ধে কিছু লিখে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার টমাস রো, রালফ ফিচ, হকিন্স, এডওয়ার্ড টেরী, ফরাসী দেশীয় বার্ণিয়ো টেরী, টেভার্নিয়ে, ইটালীর মানুচী ইত্যাদি। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে এই সব বিদেশীরা সাধারণতঃ সম্রাটের দরবার ও সাম্রাজ্যের বড় বড় মানুষের কথাই লিখেছেন। তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা বিশেষ কিছু বলেন নি।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

মুঘল যুগে কৃষি ছিল প্রধান উপজীবিকা। জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। প্রধান খাদ্য শস্য ছাড়া কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আখ, রেশম, তুলা, তামাক, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি। চাষের সরঞ্জাম ছিল প্রায় বর্তমান কালের মতই। কৃষির ক্ষেত্রে ভারত ছিল স্ব-নির্ভর। খনিজ সম্পদেও ভারত ছিল সমৃদ্ধ। কুমায়ুন ও পাঞ্জাবে ছিল সোনার খনি, রাজস্থান ও মধ্যভারতে ছিল রূপোর খনি, গোলকুণ্ডায় ছিল হীরের খনি ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোহার খনি ছিল।

দেশের ভেতরে পণ্যসামগ্রীর চলাচল ছিল সহজ। এর ফলে জিনিস-পত্রের দামও ছিল সস্তা। আকবরের সময় থেকে ঔরংগজেবের সময় পর্যন্ত খাদ্যশস্য, শাক-শব্জী, মাছ, মাংস, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। আকবরের সময় গমের স্বাভাবিক দর ছিল টাকায় পনেরো মন; বাজরার দর ছিল টাকায় আঠার মন; উৎকৃষ্ট চাল ছিল টাকায় দশ মন। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই জীবন যাপন করতে পারত।

পণ্যসামগ্রীর সুলভতা

মুঘল যুগে ভারতের শিল্পও ছিল উন্নত। সুতী ও রেশম শিল্প ছিল অন্যতম শিল্প। বারাণসী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, আহমেদাবাদ ও বাংলাদেশ ছিল সুতী শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার মসলিন ছিল জগৎ বিখ্যাত। বার্ণিয়ে-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের সুতো ও রেশমের পোশাক তৈরী হত ও তা ইউরোপে রপ্তানি হত। এডওয়ার্ড টেরী ভারতের রঞ্জন শিল্পের নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জরীর কাজের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফৈজাবাদ ও খান্দেশ। লাহোর ছিল শাল ও গালিচার জন্য প্রসিদ্ধ। চিনি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশ।

শিল্প

মুঘল যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংগে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন চলত। সিংহল (শ্রীলংকা), ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, নেপাল, পারস্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সংগে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ভারত থেকে ইউরোপে নীল, আফিং, সুতী ও মসলিন পোশাক-পরিচ্ছদ, চিনি, সোরা ও মসলা রপ্তানি হত। বিদেশ থেকে আমদানি হত চীনামাটির বাসন, রুপো, ঘোড়া, মূল্যবান মণিমুক্তো, ভেলভেট, ব্রোকেড ও সুগন্ধি তেল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

মুঘল যুগে ভারত ঐশ্বর্যে ও সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল ঠিকই কিন্তু এই ঐশ্বর্য ও সম্পদ সামান্য কিছু লোকের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। একদিকে রাজপরিবার ও অভিজাতদের বিপুল ঐশ্বর্য, বিলাস-ব্যসন, অন্যদিকে জনসাধারণের দারিদ্র্য ছিল সেযুগের ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য। আমীর-ওমরাহ, বণিক ও মধ্যবিত্ত প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বটে, কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের অবস্থা মোটের ওপর খারাপ ছিল। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপত্তিতে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকত না।

জীবন যাত্রায় অসাম্য

মুঘল যুগে সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আমীর-ওমরাহ ও জমিদাররা ছিলেন উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ; ব্যবসায়ী, বণিক, চিকিৎসক, পণ্ডিত প্রভৃতি ছিলেন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ; চাষী, মজুর, দোকানদার ও ভৃত্য প্রভৃতি ছিলেন নিম্নতম শ্রেণীভুক্ত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আমোদ-প্রমোদে ও বিলাসিতায় যথেচ্ছভাবে খরচ করতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা খুব পরিশ্রমী ছিলেন ও তারা লোভাতুর শাসকশ্রেণীর দৃষ্টি এড়াবার জন্য অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান খুব সামান্যই ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর ; শহরের বাইরে মাটির ঘরে তারা বাস করত।

সামাজিক স্তর বন্যাস

মুঘল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। মুঘল সম্রাটরা হিন্দু ও মুসলমান শিল্পী এবং পণ্ডিতদের সমান সমাদর করতেন। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিভবন, আকবরের আমলে বুলন্দদরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ, জুম্মা-মসজিদ, শাহজাহানের আমলের আগ্রা দুর্গ, তাজমহল, লাল কেল্লার দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি মুঘল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শিল্প সংস্কৃতি

মুঘল আমলে চিত্রশিল্পও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বাবর ও হুমায়ুন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবর একটি পৃথক চিত্রশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। জাহাংগীর নিজেই ছবি আঁকতেন এবং চিত্র-সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। চিত্র শিল্পের সংগে এই যুগে সংগীত শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয়। সংগীত প্রীতির জন্য আকবরের

খ্যাতি ছিল। তাঁর সভায় ছত্রিশ জন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এঁদের মধ্যে মিঞ্‌া তানসেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

মুঘল আমলে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চারও উন্নতি হয়েছিল। মুঘল সম্রাটদের প্রায় সবাই বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বাবর ও জাহাংগীরের আত্মজীবনী, অবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরী সেযুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। শাহজাহান ও ঔরংগজেবের আমলেও ফার্সী ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসীদাস ছিলেন আকবরের সমসাময়িক। তাঁর লেখা 'রামচরিত মানস' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাংগালী কবি কাশীরামদাস এই যুগে 'মহাভারত' বাংলাভাষায় রচনা করেন। এই যুগেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের খুব প্রসার ঘটেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-৫৭ খ্রীঃ)

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা শাহজাহানের আমলে শুরু হয় এবং ঔরংগজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঔরংগজেবের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন অযোগ্য শাসক। তাঁদের বিলাস-ব্যসন ও মুঘল আমীর-ওমরাহদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ভেংগে পড়ে, সেই সংগে সাম্রাজ্যের ভাংগন দ্রুত হয়। চারিদিকে বিদ্রোহ ও অশান্তি ব্যাপক হয়ে ওঠে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। রাজপুত, শিখ ও জাঠ-রা বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী হয়। রাজপুতানার যোধপুর ও অম্বর রাজ্য দুটো স্বাধীন হয়ে যায়। শিখনেতা বান্দার নেতৃত্বে শিখরা পাঞ্জাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ঔরংগজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে মথুরার জাঠরা বিদ্রোহী হয়েছিল। ঔরংগজেবের মৃত্যুর পর জাঠরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উত্তর প্রদেশের কিছু অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মারাঠারা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তারা দক্ষিণ-ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে উত্তর-ভারতে প্রভূত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে দিল্লী লুঠ করেন। রাজধানীর অগণিত মানুষ নিহত হয় ও বাড়ীঘর, হাট-বাজার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নাদির শাহ মুঘলদের ময়ূর সিংহাসন ও প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

এর কিছুদিন পরে আফগানিস্থানের রাজা আহম্মদ-শাহ-আব্দালি ভারত আক্রমণ করে (১৭৪৮ খ্রীঃ) পাঞ্জাব দখল করেন। তিনি কয়েক বার ভারতে আসেন ও দিল্লী লুঠ করেন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এর মধ্যেই বাংলাদেশে ইংরাজ বণিকরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঔরংগজেবের মৃত্যুর পর আইনত বাংলাদেশে মুঘল সম্রাটদের প্রভুত্ব স্বীকৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে আলিবর্দি খাঁর সময় পর্যন্ত বাংলার নবাবরা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর (১৭৫৬ খ্রীঃ) সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। তাঁর সংগে ইংরাজদের বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) সিরাজের পরাজয় ঘটলে বাংলায় ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এর পর থেকে শুরু হয় ইংরাজদের ভারত বিজয়ের পালা।

(২) ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

মুঘল আমলের ইতিহাসের এক অন্যতম ঘটনা হল ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমন ও নানা স্থানে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন। এ ব্যাপারে প্রথমে পর্তুগীজরাই অগ্রণী হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার জলপথের সন্ধান দিলে পর্তুগীজ বণিকরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। পশ্চিম উপকূলে কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, পূর্ব উপকূলে নাগাপট্টম ও সানথোম এবং বাংলাদেশে হুগলি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগীজ শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল গোয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগে তারা জলদস্যুতাও করত। এই কারণে সম্রাট শাহজাহানের আদেশে পর্তুগীজদের হুগলী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় (১৬৩২ খ্রীঃ)। অবশ্য গোয়া, দমন, দিউ বহুকাল তাদের দখলে থাকে। পর্তুগীজদের অসাফল্যের অন্য কারণ হল ওলন্দাজ ও ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও বাণিজ্য কুঠি স্থাপন

সপ্তদশ শতকে ভারতে আসে ওলন্দাজ বণিকেরা। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে ভারত মহাসাগরের ওপর একচ্ছত্র

আধিপত্য বিস্তার করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু ছিল পর্তুগীজরা। ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের পরম শত্রু কালিকটের রাজার সংগে সন্ধি করে। সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল কালিকট ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দেওয়া।

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে সিংহল দখল করে ও পরে কোচিন দখল করে। ওলন্দাজরা বাংলাদেশে চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর ; বিহারে পাটনা ও উড়িষ্যায় বালেশ্বরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। প্রথম দিকে ওলন্দাজ ও ইংরাজরা মিলিতভাবে পর্তুগীজদের বিরোধিতা করে। কিন্তু পর্তুগীজদের পতনের পর ওলন্দাজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ইংরাজরা। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা হুগলীতে একদল সেনাবাহিনী নিয়ে আসলে ইংরাজ কোম্পানীর অধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভ তাদের এক যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বণিকদল ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হকিন্স জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। জাহাঙ্গীর হকিন্সের শিষ্টাচারে খুশী হয়ে পশ্চিম ভারতের সুরাট বন্দরে ইংরাজদের কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। কিন্তু সেসময় মুঘল দরবারে পর্তুগীজদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পর্তুগীজদের বিরোধিতার জন্য জাহাঙ্গীর শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। এর পরে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্-এর রাজদূত হিসাবে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। সম্রাট টমাস রো-কে সমাদর করেন এবং ইংরাজরা আগ্রা, আমেদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কুঠি স্থাপন করে। ঔরংগজেবের রাজত্বের শেষের দিকে ইংরাজরা জব চার্ণকের নেতৃত্বে কলকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা করে (১৬৯০ খ্রীঃ) ও ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক দুর্গও নির্মাণ করে।

সবার শেষে আসে ফরাসী বণিকেরা। ক্যারোঁ নামে এক ফরাসীর চেষ্টায় সুরাটে ফরাসী কোম্পানীর প্রথম কুঠির প্রতিষ্ঠা হয় (১৬৬৮ খ্রীঃ)। এরপরে মসুলিপট্টম, পণ্ডিচেরী, মাহে, কালিকট, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানেও তাদের কুঠি স্থাপিত হয়।

এইভাবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতের বহু জায়গায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য-কুঠির প্রতিষ্ঠা হয়।

ইউরোপীয় বণিকদের আসার ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিস্তার শুরু হয়। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও শুরু হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথমে দাক্ষিণাত্যে শুরু হয় এবং তা পরে বাংলাদেশেও প্রসারিত হয়। সেসময় দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে খুবই গোলযোগ চলছিল। ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লে ভেবে দেখলেন যে যুদ্ধবিগ্রহে দেশীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা সহজ হবে। তিনি কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসনের দাবিদারদের দুইজনের পক্ষ অবলম্বন করে অপর দুইজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। ডুপ্লে-র সংকল্প সফল হয়। তাঁর মনোনীত প্রার্থীরাই কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়।

ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফরাসী প্রতিপত্তিতে আশংকিত ইংরাজরাও দাক্ষিণাত্যের গৃহযুদ্ধে যোগ দেয়। এ ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী হন রবার্ট ক্লাইভ। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ভারতে দাক্ষিণাত্যের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যেও পরপর তিনটি যুদ্ধ বাধে—যথা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। সে সময় বাংলাদেশে ফরাসীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) ইংরাজদের অধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভ সিরাজকে পরাস্ত করেন ও ফরাসীদের চন্দননগরের কুঠি দখল করে নেন। এইভাবে বাংলায় ফরাসীদের প্রতিপত্তি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়।

(৩) মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার

ঔরংগজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলকে মহারাষ্ট্র দেশ বলা হয়। এই দেশ পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে হায়দ্রাবাদ ও উত্তর-পূর্বে নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে সময় মারাঠারা নানা দলে ও উপদলে বিভক্ত ছিল। যিনি মারাঠাদের এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ

পরিচয়

জাতিতে পরিণত করেন তিনি হলেন ছত্রপতি শিবাজী। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন শাহজী ভোঁসলে ও মাতা জীজাবাঈ। শাহজী ছিলেন বিজাপুর সুলতানের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শিবাজীর বাল্যকাল কাটে পুণায় মাতা জীজাবাঈ ও ব্রাহ্মণ গুরু কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে। ধর্মপরায়ণা মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনে শৈশবেই শিবাজীর মনে বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। মহারাষ্ট্র দেশে এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেন। তিনি পার্বত্য মাওয়ালিদের নিয়ে এক দুর্ধর্ষ দল গঠন করেন এবং বিজাপুরের অনেকগুলো দুর্গ দখল করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করার জন্য সেনাপতি আফজল খাঁ-র নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান (১৬৫৯ খ্রীঃ)। শিবাজীকে দমন করতে ব্যর্থ হলে আফজল খাঁ সন্ধির প্রস্তাব দেন। শিবাজী আফজল খাঁ-র শিবিরে আসেন। আফজল খাঁ আলিঙ্গন করার সুযোগে শিবাজীকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হলে, শিবাজী লোহার তৈরী 'বাঘনখ'-নামে এক অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁর বুক বিদীর্ণ করেন।

শিবাজী

শিবাজী

সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। শিবাজী কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কান দখল করেন। শিবাজীর সাহস ক্রমেই বেড়ে যায়। এরপর তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের রাজ্যে হানা দিয়ে লুঠপাট করতে থাকেন। ফলে মুঘলদের সংগে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। ঔরংগজেবের আদেশে দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু শিবাজীর হঠাৎ আক্রমণে মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পালিয়ে যান। শিবাজী পুণা দখল করেন। শিবাজীর শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ঔরংগজেব অম্বরের রাজা জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। শিবাজী পরাস্ত হন ও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় মুঘল দরবারে আসেন। কিন্তু তাঁকে সেখানে বন্দী করা হয়। চতুর শিবাজী সেখান থেকে

পালিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর অভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন। আবার মুঘলদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তিনি তাঁর দুর্গগুলো পুনরুদ্ধার করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় (১৬৮০ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারতে মারাঠাশক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

শিবাজীর পরে মারাঠা শক্তির বিস্তার

শিবাজীর মৃত্যুর পর মুঘলদের সঙ্গে মারাঠাদের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও মুঘলরা মারাঠা রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নেয়। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী যুদ্ধে বন্দী হয়ে নিহত হন। এরপর শিবাজীর আর এক পুত্র রাজারাম রাজা হন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী তারাবাই মারাঠাদের নেতৃত্ব করেন। তিনি মারাঠাদের সংঘবদ্ধ করে মুঘলদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু করেন। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য-ভারতের কিছু অঞ্চলে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ঔরংগজেব মারাঠাদের দমন করতে ব্যর্থ হন।

শিবাজীর পৌত্র শাহু ছিলেন অযোগ্য শাসক। তিনি বালাজী বিশ্বনাথ নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত সমর্থককে 'পেশোয়া' বা প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করে তাঁর হাতে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এইভাবে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া বংশের উৎপত্তি হয়। পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠারা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন কূটনীতিজ্ঞ ও সুযোগ্য শাসক। তিনি ১৭১৪ থেকে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেশোয়া-পদে আসীন ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের কথা প্রচার করেন। তিনি মুঘলদের কাছ থেকে মালব ও উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চল দখল করে নেন। তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাওএর সময় (১৭৪০ — ৬১ খ্রীঃ) মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। দক্ষিণ ও

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঃ মারাঠাদের বিপর্যয়

মধ্য-ভারতে মারাঠারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। মারাঠারা পাঞ্জাব দখল করায় আফগানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ আব্দালী ভারত আক্রমণ করেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। ফলে মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) আব্দালী মারাঠাদের শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের শক্তি, মর্যাদা ও সংহতি

যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয় এবং বাংলায় ইংরাজদের ও পাঞ্জাবে শিখদের উত্থানের পথ সহজ হয়।

(৪) শিখজাতির উত্থান ও সংগঠন

শিখধর্মের প্রবর্তক **'গুরু নানকের'** সময় থেকে (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ) ভারতের ইতিহাসে শিখজাতির আবির্ভাব হয়। গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। তাঁর অনুচরবর্গ 'শিখ' বা 'শিষ্য' নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন শিখদের প্রথম গুরু।

গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস, গুরু রামদাস
গুরু অর্জুন

গুরু নানকের পরবর্তী শিখগুরু ছিলেন **অঙ্গদ** (১৫৩৯-৫২ খ্রীঃ)। পরবর্তী শিখ গুরু **অমরদাস** (১৫৫২-৭৪ খ্রীঃ) বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বেশ কিছু জাঠও ছিল। শিখ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র অমৃতসর শহরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পরবর্তী গুরু **রামদাসের** নাম জড়িত (১৫৭৪-৮১ খ্রীঃ)। সম্রাট আকবরের কাছ থেকে একখণ্ড জমি উপহার পেয়ে সেই জমির উপর তিনি অমৃতসর নামে একটি পুকুর খনন করেন। তাঁর আমলে শিখধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। পরবর্তী গুরু **অর্জুন** (১৫৮১-১৬০৬ খ্রীঃ) ছিলেন সংগঠনী প্রতিভার অধিকারী। তিনি অমৃতসরকে ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র করে তোলেন এবং তা শিখদের প্রধান তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। গুরু অর্জুন সর্বপ্রথম শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সংকলন করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে আশ্রয় দান করার অপরাধে গুরু অর্জুনকে হত্যা করা হয়। গুরু অর্জুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরু **হরগোবিন্দ** (১৬০৬-৪৫ খ্রীঃ) সামরিক সংগঠনে মনোযোগী হন। পরবর্তী গুরু **'হররায়'** (১৬৪৫-৬১ খ্রীঃ), শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে দারাশিকোর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই অপরাধের জন্য ঔরংগজেব তাঁকে হত্যা করেন। শিখদের অষ্টম গুরু ছিলেন **হরকিশান**। নবম গুরু **তেগবাহাদুর** (১৬৬৪-৭৫ খ্রীঃ), ঔরংগজেবের হিন্দু-বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করায় সম্রাটের বিরাগভাজন হন। তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে আনা হয় এবং হত্যা করা হয়। তেগবাহাদুরের এই নির্মম হত্যা শিখদের মনে মুঘলদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহার সঞ্চার করে।

শিখদের দশম ও শেষ গুরু ছিলেন গুরু **গোবিন্দ সিংহ** (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ)। পিতার নির্মম হত্যা গোবিন্দ সিংহের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

তিনি প্রথমেই জম্মু ও গাড়ওয়ালের রাজাদের সংগে যুদ্ধ করে কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই দুর্গগুলোকে মুঘলদের সংগে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা। তিনি দুইটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করেন। **প্রথমতঃ**, তিনি ব্যক্তিগত গুরুপদ বাতিল করেন এবং ঘোষণা করেন যে **খালসা-সংস্থাই** হল শিখদের গুরু। 'খালসা' শব্দের অর্থ হল পবিত্র।

সংস্কার

তিনি ঘোষণা করেন যে খালসায় বর্ণ, জাতি, উঁচু-নীচের কোন ভেদ থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি খালসা সংগঠন করে শিখ জাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। এইভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ এক বীরদৃপ্ত ও স্বাধীনতাকামী জাতি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর **বান্দা** নামে এক নেতার অধীনে শিখরা সংঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হয়ে নিহত হন (১৭১৬ খ্রীঃ)। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পর পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের অবসান ঘটলে শিখদের সংগে আহম্মদ শাহ আবদালীর যুদ্ধ বাধে। আবদালী জয়ী হন বটে কিন্তু শিখদের ক্রমাগত প্রতি-আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে তিনি পাঞ্জাব ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন (১৭৬২ খ্রীঃ)। আবদালী ভারত ছেড়ে চলে গেলে শিখরা রাওয়ালপিণ্ডি ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। এইভাবে শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হয় এবং তারা দশটি 'মিসিল' বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মিসিলগুলোর সংগঠন ছিল সামন্ততান্ত্রিক। মিসিলের সর্দারগণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহ শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পাঞ্জাবে শিখ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

রঞ্জিৎ সিংহ

অনুশীলনী

১। মুঘল সম্রাটদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কি জান ? ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২। বাবর কিভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ?
৩। হুমায়ুন ও শের-শাহের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কি জান ?
৪। আকবরের রাজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। শাহজাহান ও ঔরংগজেব দাক্ষিণাত্য বিজয়ে কতদূর সফল হন ?
৬। মুঘলযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। মুঘল যুগের শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি জান ?
৮। ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৯। কিভাবে মুঘলযুগের জীবনধারা জানতে পারা যায় ?
১০। মুঘল যুগে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ? হকিন্স ও টমাস রো কে ছিলেন ?
১১। ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন্ জাতি সর্বপ্রথম ভারতে বাণিজ্য আরম্ভ করে ? তারা কোথায় কোথায় কুঠি স্থাপন করে ?
১২। ভারতে ইংরাজদের আগমন ও তাদের বাণিজ্য স্থাপন সম্বন্ধে কি জান ?
১৩। ভারতে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি প্রথম সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা করে ?
১৪। ভারতে ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৫। মহারাষ্ট্রদেশ ও মারাঠাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১৬। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মারাঠা ও শিখ জাতির অভ্যুদয়ের বিষয় লেখ।
১৭। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৮। 'পেশোয়া'-কাকে বলা হয় ? পেশোয়াদের আমলে মারাঠা শক্তির বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৯। শিখ বলতে কি বোঝায় ? শিখদের গুরুর সংখ্যা কজন ? তাঁদের সম্বন্ধে কি জান ?
২০। শিখ জাতির উত্থানের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২১। গুরু গোবিন্দ সিংহের সংস্কারগুলি কি ছিল ?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম স্তর ঃ বাংলায় ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপন

আগেই বলা হয়েছে যে ঔরংগজেবের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তারা (নবাব নামে পরিচিত) স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করতে থাকেন, শুধু নামে মাত্র তাঁরা মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলে (১৭১৭-২৭ খ্রীঃ) ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নির্দিষ্ট শুল্কের বিনিময়ে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল। সেই সঙ্গে ফরাসীরাও বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল। ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল চন্দননগর দুর্গ। নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পরে বাংলার নবাব হন তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ)।

সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ বাধে ও তা ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময় দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ইংরাজ ও ফরাসীরা যথাক্রমে কলকাতা ও চন্দননগরের দুর্গের সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়। সিরাজ উভয় পক্ষকে তা করতে নিষেধ করেন। ফরাসীরা তাঁর আদেশ পালন করে, কিন্তু ইংরাজরা তা অগ্রাহ্য করে। ইংরাজদের ঔদ্ধত্য দেখে সিরাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। শেষে নবাবের বিরুদ্ধ পক্ষের একজনকে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় দেওয়াতে সিরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ইংরাজদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতা আক্রমণ করে তা দখল করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভ নামে এক ইংরাজ কর্মচারী এবং ইংরাজ নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন মাদ্রাজ থেকে এসে কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজের সন্ধি হয়।

সিরাজের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ

কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজের শান্তি বেশী দিন টিকল না। নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও ইংরাজরা ফরাসীদের চন্দননগর কুঠি দখল করে নেয়। সিরাজ তাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ঠিক এই সময় বাংলার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক (যথা জগৎ শেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ ইত্যাদি) সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নবাবের সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজরা এক অপূর্ব সুযোগ পায়। ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। স্থির হয় যে নবাব হয়ে মীরজাফর ইংরাজদের প্রচুর পুরস্কার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে

দেবেন। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্যোগ আয়োজন শেষ হলে ক্লাইভ একদল সৈন্য নিয়ে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন। এই সংবাদে সিরাজ স্তম্ভিত হন কারণ তিনি ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানতেন না। যা হোক এই অবস্থায় সিরাজও তাঁর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। মুর্শিদাবাদ থেকে তেইশ মাইল দূরে পলাশীর মাঠে দুপক্ষে যুদ্ধ হয় (১৭৫৭ খ্রীঃ) যা **পলাশীর যুদ্ধ** নামে খ্যাত। প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ না করে তাঁর

পলাশীর যুদ্ধ ও ফলাফল

সিরাজ-উদ-দৌলা

রবার্ট ক্লাইভ

সৈন্যদের নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফলে যুদ্ধে ইংরাজদের জয় হয়। ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রেই মীরজাফরকে নতুন নবাব বলে অভিনন্দিত করলেন। মীরজাফর নবাব হলেন বটে কিন্তু দেশশাসনের সব ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে এসে পড়ে। বাংলার রাজনীতিতে ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয় এবং বাংলাকে ভিত্তি করে ভারতে ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পালা শুরু হয়।

পলাশী যুদ্ধের তিন বছর পর ইংরাজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে নবাব-পদে অধিষ্ঠিত করে (১৭৬০-৬৩ খ্রীঃ)। মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও কর্মদক্ষ পুরুষ। ইংরাজদের প্রভুত্ব ও ঔদ্ধত্য মীরকাশিমের কাছে ছিল অসহ্য। ফলে ইংরাজদের সংগে তাঁর বিবাদ শুরু হয়। ইংরাজরা হঠাৎ পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করলে মীরকাশিমের সংগে তাদের যুদ্ধ বেধে যায়। মীরকাশিম পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে

মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ

অযোধ্যা রাজ্যে আশ্রয় নেন। তাঁর এই দুর্দিনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম। বিহারের অন্তর্গত বক্সারে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হয় (১৭৬৪ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ইংরাজদের জয় হয়। সুজা-উদ-দৌলা ও মুঘল সম্রাট ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করেন, আর মীরকাশিম দেশত্যাগী হন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রবার্ট ক্লাইভকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করে আবার বাংলায় পাঠান। ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমের কাজ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই তিন প্রদেশে ইংরাজদের প্রভুত্ব সুদৃঢ় হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

পূর্বভারতে আধিপত্য স্থাপনের পর থেকে ইংরাজ শক্তির দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। সে সময় ভারতে দুটি দেশীয় রাজ্য ছিল ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায়। যথা—মহীশূর ও মারাঠাশক্তি। কর্ণাটকে যখন রাজনৈতিক গোলযোগ ও বাংলায় যখন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটছিল, সে সময় মহীশূরে রাজ্যে হায়দার আলি নামে এক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের অভ্যুদয় ঘটে।

মহীশূরের পতন

হায়দার আলি প্রথমজীবনে সামান্য এক সৈনিক ছিলেন। পরে নিজের প্রতিভা ও সমর কুশলতার ফলে মহীশূর রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন এবং এই কারণে তিনি প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ফরাসীদের সাহায্যে এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং আশেপাশের রাজ্যগুলো একের পর এক জয় করেন। হায়দারের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তার ইংরাজদের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। হায়দার যখন মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত, সেই সময় ইংরাজরা হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহীশূর আক্রমণ করে। ফলে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ)। উভয়পক্ষে জয়-পরাজয়ের পর সন্ধি হয়। কিন্তু এই সন্ধি বেশী দিন স্থায়ী হল না। ইংরাজরা হায়দারের রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে আক্রমণ করায় হায়দার যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয় (১৭৮০-৮৪ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে সাফল্যের মুখে হায়দারের হঠাৎ মৃত্যু হয়। হায়দারের পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইংরাজরা পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

টিপুর ইংরাজবিদ্বেষ তাঁর পিতার অপেক্ষাও বেশী ছিল। যদিও হায়দারের মত সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা টিপুর তেমন ছিল না। টিপু ফরাসীদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ফ্রান্সেও একবার দূত পাঠান। টিপুর ফরাসী-প্রীতি ইংরাজদের আশংকার কারণ হয়ে ওঠে। টিপু ইংরাজদের মিত্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৃতীয় ইংগ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৭৯০ খ্রীঃ)। ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের সংগে মিলিত হয়ে টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন ও মহীশূরের রাজধানী শ্রীরংগপত্তম অবরোধ করেন। টিপু পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। টিপু তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠাদের ছেড়ে দেন। পরাজয়ের ফলে টিপুর শক্তি খর্ব হয় ও দক্ষিণ-ভারতে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের আরও প্রসার ঘটে। তিনি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নামে এক অভিনব নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতির শর্ত ছিল এই যে ইংরাজরা ভারতীয় মিত্র রাজাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ; এর বিনিময়ে প্রত্যেক রাজাকে রাজ্যের মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য পোষণ করতে হবে এবং তার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হবে। দেশীয় রাজাদের মধ্যে নিজামই সবার আগে এই শর্ত মেনে নেন। মারাঠাদের মধ্যে একমাত্র পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও তা মেনে নেন। কিন্তু টিপু সুলতান ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করায় টিপুর সংগে আবার যুদ্ধ বাধে যা চতুর্থ বা শেষ ইংগ-মহীশূর যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৭৯৯ খ্রীঃ)। অসীম বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেও শেষপর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) আহম্মদ শাহ আবদালীর কাছে মারাঠাদের বিপর্যয় ঘটেছিল। পেশোয়া মাধব রাও-এর আমলে আবার মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মাধব রাও-এর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাও ষড়যন্ত্র করে নারায়ণ-রাও-কে হত্যা করে পেশোয়া-পদ দখল করেন। নানা ফড়নবীশ প্রমুখ মারাঠা নেতারা রঘুনাথ রাওকে গতিচ্যুত করলে রঘুনাথ রাও ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী

মারাঠা শক্তির পতন

হন। মারাঠাদের এই গৃহ বিবাদের ফলে পশ্চিম ভারতে ইংরাজদের শক্তি বিস্তারের এক অপূর্ব সুযোগ আসে। ইংরাজরা রঘুনাথ রাওকে সঙ্গে নিয়ে পুণার দিকে এগিয়ে যায়। নানাফড়নবীশও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যান। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৭৭৫-৮১ খ্রীঃ)। পুণার কাছে ইংরাজ বাহিনী পরাস্ত হয়। ইংরাজরা রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করে।

নানা ফড়নবীশ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মারাঠা রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠা রাজ্যে আবার বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন ভীরু ও অপদার্থ। সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে দ্বিতীয় বাজীরাও অসহায় হয়ে পড়েন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, হোলকার পেশোয়াকে পুণা থেকে তাড়িয়ে দিলে, তিনি ইংরাজদের শরণাপন্ন হন এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ইংরাজদের 'অধীনতামূলক মিত্রতা' প্রস্তাবে রাজী হন। কিন্তু রাজ্য পুনরুদ্ধার করার পর দ্বিতীয় বাজীরাও অনুতপ্ত হন এবং তিনি ইংরাজদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এই সময় দুই মারাঠা নায়ক সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ইংরাজদের প্রতিপত্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে কোম্পানীর রাজ্য আক্রমণ করেন। ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮০৩ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁরা পরাস্ত হন। সিন্ধিয়া ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ইংরাজদের অস্বস্তির কারণ ছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে এক নতুন অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষর করার জন্য বাধ্য করা হলে তিনি বিদ্রোহী হন। সেই সুযোগে হোলকার ও ভোঁসলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮১৭-১৯ খ্রীঃ)। পেশোয়া কিড়কির যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। হোলকার ও ভোঁসলেও পৃথক পৃথক ভাবে পরাস্ত হন। এই যুদ্ধের ফলে পেশোয়ার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় এবং হোলকার ও ভোঁসলে ইংরাজদের অধীন-মিত্র হিসাবে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এইভাবে ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়ের শেষ হয়।

পরবর্তী স্তর

পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার ঘটে। এই সময়ে ইংরাজদের প্রধান সাফল্য হল শিখ-শক্তি ধ্বংস করে পাঞ্জাব দখল করা। জামান শাহ্ নামে এক আফগ্যান রাজা শিখ নেতা রঞ্জিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আমরা আগেই দেখেছি যে অষ্টাদশ শতকে আহম্মদ শাহ্ আবদালী ভারত ছেড়ে চলে গেলে শিখেরা দশটি 'মিসিল' বা দলে বিভক্ত হয়ে যায়। উনবিংশ শতকের প্রথমে এই রকম একটি দলের নায়ক ছিলেন রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ)। তিনি নিজের দক্ষতা ও সামরিক প্রতিভাবলে এইসব মিসিলকে এক করে একটি শক্তিশালী শিখরাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি ইংরাজদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে নতুন শিখ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর খালসাবাহিনী শিখরাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। খালসাবাহিনীর ঔদ্ধত্য থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য শিখ নেতারা ইংরাজদের সঙ্গে খালসাবাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত করার পরিকল্পনা করেন। শিখ নেতাদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে খালসাবাহিনী ইংরাজদের রাজ্য আক্রমণ করলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে খালসাবাহিনী পরাস্ত হয়। ইংরাজরা প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও কাশ্মীর রাজ্যটি লাভ করে। এই সঙ্গে লাহোর দরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখারও ব্যবস্থা হয়।

শিখ শক্তির পতন

কিন্তু শিখদের সঙ্গে ইংরাজদের শান্তি বেশীদিন টিকল না। ইংরাজ রেসিডেণ্টের কর্তৃত্ব তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠায় তারা বিদ্রোহী হয় ও কয়েকজনকে হত্যা করে। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল লর্ড-ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। চিলিয়ানওয়ালা নামে এক জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হয়। শিখবাহিনী পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ও খালসাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। পাঞ্জাব দখলে আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজদের আর একটি সাফল্য হল সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩ খ্রীঃ)। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে কয়েকজন মুসলমান আমীর সিন্ধুদেশে রাজত্ব করতেন। ইংরাজরা এঁদের সঙ্গে সন্ধি করে ব্যবসাবাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল। শেষে গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরো আমীরদের বিরুদ্ধে

সিন্ধুদেশ বিজয়

মিথ্যা অভিযোগ এনে সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। আমীররা সহজেই পরাস্ত হয়ে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এদিকে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। ইংরাজরা যখন ভারতে রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত সে সময় ব্রহ্মদেশের রাজারা পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্মীরা চট্টগ্রামের
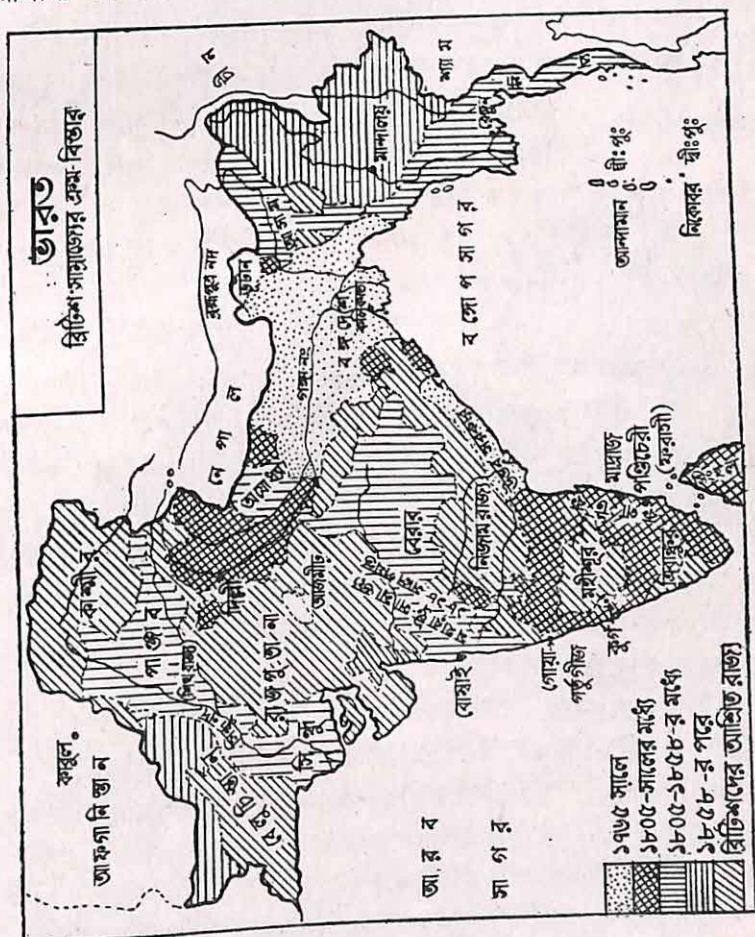
কাছে একটি দ্বীপ দখল করলে গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে (১৮২৬ খ্রীঃ) বর্মীরা পরাস্ত হয়ে আসাম, টেনাসেরিম ও আরাকান ইংরাজদের হাতে সমর্পণ করে; মণিপুর,

ব্রহ্মদেশ বিজয়

আসাম ও কাছাড় কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর আমলে ব্রহ্মদেশের সংগে আবার যুদ্ধ হয় (১৮৫২ খ্রীঃ)। বর্মীরা পরাস্ত হয় এবং ব্রহ্মদেশের কিছু অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। এরপর প্রায় একশ বছর ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ ও কূটনীতির সাহায্যে ইংরাজরা ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের অসন্তোষ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে থাকে যা শেষ পর্যন্ত এক বিদ্রোহে পরিণত হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা মহাবিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে নানা অজুহাতে অনেক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশীয় রাজাদের মনে এক ভীষণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় যে ইংরাজদের সাম্রাজ্যলিপ্সার দরুন ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যই নিরাপদ নয়।

কারণ

দেশীয় রাজ্যগুলো একের পর এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় রাজপরিবারের ওপর নির্ভরশীল বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনী ভেংগে দেওয়ায় বহু সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীর জীবন ধারণের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

বিদ্রোহের মূলে সামাজিক কারণও ছিল। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা প্রকাশ্যেই ভারতীয়দের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের নিন্দা করতেন। এছাড়া রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ভারতীয়দের মনে এই আশঙ্কা জাগায় যে ইংরাজ সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা।

ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেও অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। সামরিক কারণে ভারতীয় সিপাহীদের বিদেশে পাঠান হত। ফলে সিপাহীরা ধর্মনাশের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে।

এইভাবে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তখন 'এনফিল্ড রাইফেল'-এর প্রবর্তন করা হলে সিপাহীদের মধ্যে

আগুন জ্বলে ওঠে। গুজব রটে যায় যে এই রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি লাগান আছে এবং এর উদ্দেশ্য হল হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের ধর্মনাশ করা। কারণ এই কার্তুজ দাঁতে কেটে বন্দুকে পোরা হত। ১৮৫৭ সালের মার্চমাসে কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর সেনানিবাসের মংগল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করতে অসম্মত হয়ে বিদ্রোহী হলে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহের সংবাদ লক্ষ্মৌর সিপাহীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মৌর পরে মীরাটে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। সেখান থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর

বিদ্রোহের প্রসার

রাণী লক্ষ্মীবাঈ

তাঁতিয়া তোপী

দিকে অগ্রসর হয় এবং দিল্লী দখল করে বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফরপুর, আলিগড় ও পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগে স্থানীয় জনগণও যোগ দেয়। অযোধ্যার তালুকদাররা ও কৃষকরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন নানাসাহেব। তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নেত্রী ছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্রোহীদের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে বিহারের কুনওয়ার সিংহ ও অমর সিংহ এবং মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিকে ইংরাজরা পরাজয় বরণ করলেও শেষ পর্যন্ত তারা বিদ্রোহদমন করতে সক্ষম হয়। তারা দিল্লী পুনরুদ্ধার করে বাহাদুর শাহকে রেংগুনে নির্বাসিত করে। এক বছরের মধ্যে ইংরাজশক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্রোহের প্রকৃতি

কেউ কেউ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম বলে মনে করেন। বীর সাভারকার প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতি জনসাধারণের সমর্থন ছিল। যাই হোক্ এটাই ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিজিত ভারতের প্রথম প্রতিবাদও জাতীয়তাবোধের প্রথম আলোড়ন।

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

কয়েকটি কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়—যথা (১) বিদ্রোহ আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই প্রথমতঃ সীমিত ছিল। দেশের জনগণের অধিকাংশ এতে যোগদান না করায় বিদ্রোহ প্রথম থেকেই দুর্বল ছিল। (২) ঝাঁসির রাণী, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী ও অন্যান্য কয়েকজন নৃপতি ছাড়া অপরাপর দেশীয় রাজারা ও সামন্তরা বিদ্রোহে যোগ দেননি। (৩) বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব ব্যর্থতার অপর কারণ। (৪) ইংরাজ পক্ষের প্রচুর রণসম্ভার ও ইংরাজ সেনাপতিদের দক্ষতার বিরুদ্ধে বেশীদিন ধরে সংগ্রাম চালানো বিদ্রোহীদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। (৫) বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চলতে থাকায় তা দমন করা ইংরাজদের পক্ষে সহজ হয়।

ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অসন্তোষ

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। একের পর এক দেশীয় রাজাদের ধ্বংস করে তাঁদের রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ ছাড়াও, কূটনীতির সাহায্যে অনেক দেশীয় রাজাদের ওপর ইংরাজদের আধিপত্য স্থাপন করা হয়। এই প্রসংগে 'অধীনতা মূলক মিত্রতা' নীতির উল্লেখ করা যায়। রাজ্য হারাবার ভয়ে দেশীয় রাজা ইংরাজদের সংগে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। তাঁদের রাজ্য থাকল বটে কিন্তু ক্ষমতা বলতে কিছুই থাকল না—সব

ক্ষমতার অধিকারী হলেন ইংরাজ শাসকরা। ইংরাজ শাসকদের আধিপত্য ও ঔদ্ধত্য এই সব রাজাদের সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। রাজারা ইংরাজদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। রাজাদের পঙ্গু করে দিয়ে তাঁদের রাজ্যে ইংরাজদের শোষণ ও অত্যাচার অবাধে শুরু হয় যার ফলে রাজ্যের কর্মচারী থেকে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরপর 'স্বত্ববিলোপ নীতি' নামে আর এক উপায়ে অনেক দেশীয় রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বা মহাবিদ্রোহের সময় এই সব রাজাদের অসন্তোষ প্রকাশ্যে রূপ নেয়।

ইংরাজ শাসকরা সরকারের সব রকমের গুরুত্বপূর্ণ ও উঁচু পদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রাখার নীতি গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার ভারতীয়দের শাসন-সংক্রান্ত ও অর্থ-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই কোন সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়রা ইংরাজ সরকারের প্রশাসনিক নীতির বিরুদ্ধে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অসন্তোষও দানা বেঁধে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর ঘটে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ওপর কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে। কোম্পানী তথা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অর্থনীতির স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ক্রমেই আঘাত হানা হয়। সে সময় ভারতের কুটির শিল্পগুলো ছিল সমৃদ্ধ। ভারতের সুতী ও রেশমজাত পণ্যের বিদেশে খুব চাহিদা ছিল। বহু কারিগর ও শিল্পী এ সব শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এক সময় ভারতীয় সুতী ও রেশম জাত পোশাক-পরিচ্ছদ ইংল্যাণ্ডের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। তাতে ইংরাজ বস্ত্র প্রস্তুতকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাদের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় সুতী ও রেশমজাত পোশাক-পরিচ্ছদের আমদানির ওপর নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করেন। ইংল্যাণ্ডের সুতী ও রেশম প্রস্তুতকারীদের স্বার্থে ভারতের কুটির শিল্পগুলোকে নির্মম ভাবে ধ্বংস করা হয়। ভারতীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে জোর করে সস্তায় শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল কিনে তা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। সেই সব কাঁচামাল দিয়ে নানা পণ্য তৈরী করে তা ভারতে আমদানি করা শুরু হয়। এই সব পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অসমর্থ

হয়ে অগণিত ভারতীয় শিল্পী, কারিগর ও বণিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে কৃষিজীবিতে পরিণত হয় ও অনেকে বেকারে পরিণত হয়।

শিল্পী ও বণিকদের মত ভারতের কৃষকরাও নানাভাবে শোষিত হতে থাকে। কৃষক ও চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার সেযুগে ছিল সর্বজনবিদিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন করেছিল তা 'নীল-বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। জমির ওপর প্রজাদের কোন স্বত্ব না থাকায় যখন-তখন জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হত। এই সব কারণে কৃষক ও চাষীদের মনে বিদ্রোহের মনোভাব ক্রমেই তীব্র হতে থাকে এবং মাঝে মাঝে কৃষকরা বিদ্রোহ করে।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল, তার প্রকাশ আমরা দেখি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে।

অনুশীলনী

১। বাংলায় ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধের বিবরণ দাও।
৩। কাদের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ হয়? এর ফল কি হয়েছিল?
৪। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদের কারণ কি?
৫। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাজদের ক'টি যুদ্ধ হয়?
৬। 'অধীনতা মূলক মিত্রতা' বলতে কি বোঝায়?
৭। কিভাবে মারাঠা শক্তির পতন হয়?
৮। ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের ক'টি যুদ্ধ হয়? এর ফল কি হয়?
৯। ইংরাজদের সিন্ধুদেশ বিজয় সম্বন্ধে কি জান?
১০। ইংরাজদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১১। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কারণ ও তার ব্যর্থতার কারণ কি?
১২। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল?
১৩। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল বর্ণনা কর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী ঃ যুক্তিবাদ ও বিপ্লবের যুগ

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বের ইতিহাসের তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা হল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব। এই কারণে অষ্টাদশ শতককে **বিপ্লবী শতক** বলা যায়।

(১) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা যা জানি, তা একদিনে গড়ে ওঠে নি। ইউরোপের নানা দেশ থেকে নানা জাতি ও উপজাতি বিভিন্ন সময় এই মহাদেশে এসে উপনিবেশ গড়ে তোলে। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে ইংরাজদের মধ্যেও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যম দেখা দেয়। তারা দলে দলে মাতৃভূমি ছেড়ে উত্তর আমেরিকায় আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ইংল্যাণ্ডের কিছু লোক আমেরিকায় বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্স-এর ধর্মনীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদল পিউরিটান, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকায় এসে ম্যাসাচুসেট্সে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ

ক্রমে ক্রমে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর দল আমেরিকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা উত্তর আমেরিকায় **তেরোটি** উপনিবেশ গড়ে তোলেন।

প্রথম দিকে ঔপনিবেশিকদের জীবন ছিল রোমাঞ্চকর। তারা সমস্ত এলাকার জংগল পরিষ্কার করে সভ্য সমাজ গড়ে তোলেন। তাঁরা এইসব এলাকার আদিম অধিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান'দের সংগে অবিরত যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দেন এবং চাষ-আবাদ, শিল্প-বাণিজ্য শুরু করে বড় বড় গ্রাম ও সমৃদ্ধনগর গড়ে তোলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রতিটি উপনিবেশে ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁর মনোনীত একজন শাসনকর্তা পাঠাতেন। প্রত্যেক উপনিবেশে একটি গণ-পরিষদও ছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঔপনিবেশিকরা প্রচুর

স্বাধীনতা ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন স্বাধীনতা ছিল না। যেমন—ইংল্যান্ডের শিল্পের স্বার্থে কয়েকটি বিশেষ শিল্প উপনিবেশগুলোতে স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল; ইংল্যান্ডের জাহাজ ছাড়া অন্য কোনও দেশের জাহাজে উপনিবেশগুলোতে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ ছিল এবং কয়েকটি বিশেষ উৎপন্ন সামগ্রী একমাত্র ইংল্যান্ডেই বিক্রী করতে ঔপনিবেশিকরা বাধ্য থাকতেন। অবশ্য ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা বাধা-নিষেধ অমান্য করেই স্পেনীয় ও ফরাসীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের কোনও বিরোধ দেখা দেয় নি। এর কারণ ছিল কানাডার ফরাসী ঔপনিবেশিকরা প্রায়ই ইংরাজ উপনিবেশগুলোর উপর হামলা করত। এই হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঔপনিবেশিকদের পক্ষে ইংল্যান্ডের সাহায্যের দরকার হত।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে উপনিবেশগুলোর সম্পর্ক

বিরোধের সূত্রপাত

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর কানাডা ইংরাজদের দখলে আসে। ফলে ইংরাজ উপনিবেশ-গুলোর উপর ফরাসী আক্রমণের ভয় দূর হয়। ঔপনিবেশিকরা মাতৃভূমির উপর নির্ভর না করে স্বাধীনতালাভের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। সুতরাং মাতৃভূমির সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের মনোমালিন্যও শুরু হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় পূরণের জন্য উপনিবেশগুলো থেকে অর্থ আদায় করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের পার্লামেণ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিকদের ওপর 'স্ট্যাম্প কর' নামে একটা কর ধার্য করে। এই আইনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আমেরিকানদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে স্ট্যাম্প কর প্রত্যাহার করা হয় বটে কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজস্ব সচিব টাউনসেন্ড কাগজ, কাঁচ, চা ও সীসা প্রভৃতির ওপর নতুন শুল্ক ধার্য করেন। আবার প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে আপোষ করার জন্য একমাত্র চা ছাড়া অন্যান্য জিনিসের ওপর আমদানি শুল্ক বাতিল করা হয়। কিন্তু তাতেও বিরোধ মিটল না। তারা চা-এর উপর শুল্ক না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষে বোস্টন বন্দরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা বোঝাই একটি জাহাজ এলে, কয়েকজন ঔপনিবেশিক রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে সেই জাহাজে উঠে চায়ের বাক্সগুলো জলে ফেলে দেন

(১৭৭৩ খ্রীঃ)। ইংরাজ সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বোস্টন-

বন্দর বন্ধ করে দেন, ম্যাসাচুসেটসের স্বায়ত্ত শাসন বাতিল করেন এবং উপনিবেশগুলোতে ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন করেন।

এইসব বিধিব্যবস্থা ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহী করে তোলে। আমেরিকার 'তেরোটি' উপনিবেশের মধ্যে বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া শহরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে ইংল্যাণ্ডের সংগে সব রকমের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেস

ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতিও শুরু হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেক্সিংটন শহরে ইংরাজ সৈন্য গুলি চালালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই যুদ্ধের সংগে সংগে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামও শুরু হয়। এই যুদ্ধ সাত বছর ধরে চলে। লেক্সিংটনের যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু বাংকারহিলের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি উইলিয়াম হো জয়লাভ করেন। এই সময় আমেরিকানদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক শক্তিশালী ও প্রতিভাবান নেতার আবির্ভাব হয়। নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল ওয়াশিংটনের চরিত্রের মহান গুণ। তাঁর নেতৃত্ব আমেরিকানদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। যুদ্ধ পরিচালনায় ওয়াশিংটন ছিলেন পারদর্শী। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হো ওয়াশিংটনের কাছে পরাস্ত হন ও হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই দিনটি আমেরিকার ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিস আত্মসমর্পণ করলে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি অনুসারে আমেরিকার উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম

জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকার স্বাধীনতার ফলে ঃ

(১) ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় : (২) ইংল্যাণ্ড পূর্বতন ঔপনিবেশিক নীতি পরিত্যাগ করে উপনিবেশগুলোর

প্রতি উদার ও সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে, (৩) ফ্রান্স আমেরিকানদের সাহায্য করে ইউরোপে প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু তার ফলে ফ্রান্সের রাজকোষের দারুণ ক্ষতি হয় যা শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব আসন্ন করে তোলে। আমেরিকানদের আদর্শ ফরাসী জনগণের রাজতন্ত্র বিরোধী মনোভাব প্রবল করে তোলে, (৪) আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে।

ফলাফল

ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের সুদক্ষ নেতৃত্ব। একমাত্র তাঁর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সামরিক পারদর্শিতার জন্যই ঔপনিবেশিকরা সব রকম বিপদ কাটিয়ে ইংরাজদের পরাস্ত করতে সমর্থ হন। এই কারণেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির পদে তাঁকে বরণ করা হয়। ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের অপর কারণ ছিল ফরাসীদের সাহায্য। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফ্রান্স ঔপনিবেশিকদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকার দূরত্বও ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের অপর কারণ।

উপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ

(২) শিল্প বিপ্লব

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি রচনা করে ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিন্তাধারা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু মানব সভ্যতার ওপর শিল্প বিপ্লবের প্রভাব আরও বেশী। অষ্টাদশ শতকে নানা যন্ত্রের আবিষ্কার, লোহা ও বাষ্পশক্তির ব্যবহার, বড় বড় কল-কারখানার উৎপত্তি, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি, মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনকেই শিল্প বিপ্লব বলা হয়। ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় এবং পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্প-বিপ্লব-অর্থ ও প্রকৃতি

কয়েকটি কারণে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। শিল্পের প্রসারের জন্য যে সব উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজন হয় তা ইংল্যাণ্ডেই প্রথম পাওয়া যায়। যেমন—মূলধন, শ্রমিক, কয়লা, লোহা, শিল্পকৌশল,

শিল্পজাত জিনিসপত্রের বিক্রির জন্য উপযুক্ত বাজার ইত্যাদি। কারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, শ্রমিক নিয়োগ, কাঁচামাল খরিদ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর মূলধন বা পুঁজির দরকার হয়। সপ্তদশ শতক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের হাতে পুঁজিসঞ্চিত হতে থাকে। এই পুঁজি বা মূলধন শিল্পে নিয়োগ করার প্রবণতা দেখা দেয়। সপ্তদশ শতক থেকে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। আবার এই সময় থেকে ইউরোপের বহু শ্রমিক রুজি-রোজগারের খোঁজে ইংল্যাণ্ডে আসা-যাওয়া শুরু করে। সুতরাং, ইংল্যাণ্ডে কলকারখানার জন্য শ্রমিকের কোন অভাব ছিল না। অষ্টাদশ শতকেই ইংল্যাণ্ডে নানা ধরনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড (১৭০৭ খ্রীঃ) ও আয়ারল্যাণ্ডের (১৮০০ খ্রীঃ) সংযুক্তি হলে ইংল্যাণ্ডের বাজার সম্প্রসারিত হয়। ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ডের বণিকেরা উত্তর-আমেরিকা, আফ্রিকা ও পূর্ব-ভূমণ্ডলে অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত জিনিসপত্রের জন্য উপযুক্ত বাজারের কোন অভাব ছিল না।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণ

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রথম শুরু হয় বয়ন শিল্পে। কয়েকটি নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার সুতাকাটা ও কাপড় বোনার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। পূর্বে সুতাকাটা ও কাপড়বোনা হাত দিয়েই করা হত। তাতে সময় ও পরিশ্রম অনেক বেশী লাগত। কিন্তু নতুন আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বেশী পরিমাণে সুতাকাটা ও কাপড়বোনা সম্ভব হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্‌-কে ফ্লাইং-শাটল্ অর্থাৎ দ্রুতগতিতে চালান যায় এমন এক ধরনের 'মাকু' আবিষ্কার করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীভস্ 'স্পীনিং-জেনি' নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন শ্রমিক একসঙ্গে আটগাছি সুতা কাটতে পারত। দুই বছর পর আর্করাইট নামে আর এক ব্যক্তি সুতা কাটার জন্য এক উন্নতমানের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয় 'ওয়াটার-ফ্রেম'। আর্করাইট এই জল-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করে জলশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালাবার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই 'ওয়াটার-ফ্রেম' যন্ত্রটি কারখানার ভিত্তি রচনা করে বলা যায়। এই আবিষ্কারের জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ আর্করাইটকে

নতুন নতুন আবিষ্কার

বয়ন-শিল্প

নাইট-উপাধিতে সম্মানিত করেন। 'জেনি' ও 'ওয়াটার ফ্রেম' যন্ত্র দুটোর কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করে ক্রম্পটন নামে এক ব্যক্তি সুতা কাটার এক
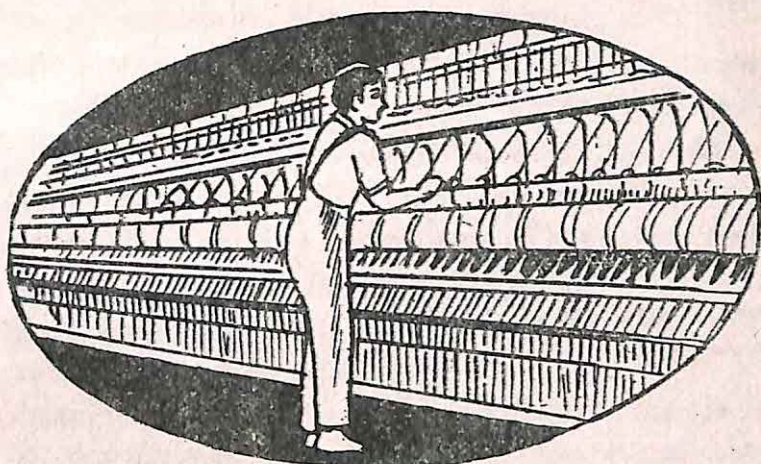
কলের তাঁত

নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'মিউল'। এই যন্ত্রটি কারখানার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্টরাইট নামে এক ব্যক্তি কাপড়বোনার জন্য 'পাওয়ার-লুম' নামে জলস্রোত চালিত কলের তাঁত আবিষ্কার করেন। এইসব আবিষ্কারের ফলে বয়ন-শিল্পে এক যুগান্তর ঘটে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

জেমস-ওয়াট

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার না হলে শিল্প-বিপ্লব বেশীদূর অগ্রসর হত কিনা সন্দেহ। যান্ত্রিক যুগে শিল্পের মূল ভিত্তি বাষ্পীয় শক্তি। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিস পেপিন নামে এক ফরাসী সর্ব প্রথম বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এই ইঞ্জিনকে আরও উন্নত করেন থোমাস-নিউকোম্যান

নামে এক ইংরাজ। কিন্তু এই ইঞ্জিন বড় বড় যন্ত্র বা মেশিন চালানোর উপযোগী ছিল না। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স-ওয়াট নামে এক ব্যক্তি বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের আরও উন্নতি সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে জেম্‌স-ওয়াটকে বাষ্প-যুগের (steam Age) প্রবর্তক বলা যায়। এর পর থেকেই রেলগাড়ী, জাহাজ, বড় বড় কারখানা প্রভৃতিতে বাষ্পীয় শক্তির প্রচলন শুরু হয়।

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার

নতুন নতুন কারখানা ও যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্য প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাতের দরকার হয়। পূর্বে জ্বালানী কাঠের সাহায্যে লোহা গলান হত। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত শ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম ডার্বি এক বিশেষ ধরনের চুল্লীতে কয়লার সাহায্যে লোহা গলাবার উপায় আবিষ্কার করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে হামফ্রে ডেভিস 'সেফ্‌টি-ল্যাম্প' (**safety lamp**) বা নিরাপদ বাতি আবিষ্কার করলে কয়লাখনির কাজ সহজ ও নিরাপদ হয়। এইসব আবিষ্কারের ফলে বড় বড় লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে এবং লোহা ও ইস্পাতের তৈরী বহু নতুন নতুন জিনিসপত্র তৈরী হতে থাকে।

লোহা, ইস্পাত ও কয়লার প্রচলন

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডে কৃষির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। আগে কৃষকদের জমি ছড়ান-ছিটান থাকত। দু'বছর চাষের পর প্রতি তিন বছর জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য তা অনাবাদি রাখা হত। ফলে ফসলের উৎপাদন কম হত। ইংল্যাণ্ডের একজন জমিদার চার্লস টাউনসেন্ড আবিষ্কার করেন যে প্রতি তিন বছর জমি পতিত না রেখে যদি ফসলের পরিবর্তন করা যায়, তাহলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় না। তিনি-ই প্রথমে একই জমিতে এক এক বছর এক এক ধরনের ফসল উৎপাদন করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। শালগম, যব ও তিনপাতাযুক্ত এক ধরনের চারাগাছের চাষ করে তিনি প্রমাণ করেন যে এর ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে ও ফসলও চমৎকার হয়। কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের আর একটা কারণ হল নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন : ইস্পাতের তৈরী লাঙল, মই এবং বীজ বপন করার জন্য যান্ত্রিক জাঁতা। সেই সঙ্গে জমিতে কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথাও চালু হয়। যন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহার শুরু হলে ফসলের উৎপাদন খুব বেড়ে যায়।

কৃষি-বিপ্লব

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই এক বিরাট পরিবর্তন আসে, যা পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আসে। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্পজাত জিনিসপত্র অন্যদেশে বিক্রী করে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। তাতে ধনী শিল্পপতি ও বণিকেরা প্রধানতঃ লাভবান হলেও সংগে সংগে সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার মানও উন্নত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠে ও হাজার হাজার মানুষ জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। বাষ্পীয়-ইঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তর ঘটে। ইংল্যাণ্ডে রেলপথের প্রসার হয় এবং সেই সংগে বাষ্পীয়-ইঞ্জিন চালিত জাহাজের প্রচলনও শুরু হয়।

বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠার ফলে ফ্যাক্টরী বা কারখানা-প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এর ফলে কুটির শিল্পগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সামান্য মজুরীর আশায় শ্রমিক ও বেকার গ্রামবাসীরা দলে দলে শিল্প-শহরগুলোতে ভীড় করে। ফলে একদিকে গ্রামগুলো জনবিরল হয়ে ওঠে ও অন্যদিকে শিল্প-শহরগুলো জনবহুল হয়ে ওঠে। কারখানাগুলোকে ঘিরে শ্রমিকদের জন্য ঘরবাড়ী তৈরী করা হয়। কিন্তু সেগুলো ছিল যেমন নোংরা তেমনি অস্বাস্থ্যকর। অধিক সংখ্যক শ্রমিককে অল্প জায়গার মধ্যে থাকতে হত। ফলে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। তাছাড়া কারখানার কাজের পদ্ধতিও ছিল একঘেঁয়ে। কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না এবং শ্রমিকদেরও কাজের কোন স্বাধীনতা ছিল না। প্রথমদিকে মালিকদের ভয়ে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে পারত না। কিন্তু ক্রমেই তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে ও সংঘবদ্ধ হয়ে নানা দাবি-দাওয়া করতে থাকে।

(৩) ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপ তথা বিশ্বের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব কোন একটি আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। এর মূলে ছিল নানা কারণ।

বিপ্লবের কারণ : অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের সমাজ-জীবনে নানা অত্যাচার ও অন্যায় চলছিল। ফ্রান্সের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ত-প্রথাভিত্তিক।

সামন্ত প্রথা অনুসারে ফ্রান্সের দুই শ্রেণীর খুব আধিপত্য ও প্রাধান্য ছিল। যথা—অভিজাত শ্রেণী ও যাজকশ্রেণী। তাঁরা সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ঘৃণাবোধ করতেন এবং সুরম্য প্রাসাদে আড়ম্বর পূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। রাষ্ট্রের সবরকম উঁচু-পদের একমাত্র অধিকারী ছিলেন অভিজাতরা।

সুবিধা-ভোগী অভিজাত শ্রেণী

ফ্রান্সের যাজকরা ছিলেন দুইভাগে বিভক্ত। যথা—ধনী যাজক ও দরিদ্র যাজক। ধনী যাজকরা নানা সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরাও রাজার অনুগ্রহ লাভ করতেন এবং বছরের বেশীর ভাগ সময় রাজদরবারে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন। কিন্তু নিচু শ্রেণীর যাজকরা ছিলেন দরিদ্র ও সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমন কি ধনী যাজকরা দরিদ্র যাজকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেও ঘৃণাবোধ করতেন। ফলে ধনী যাজকদের প্রতি দরিদ্র যাজকদের ঘৃণা ও অসন্তোষের সীমা ছিল না।

সুবিধা-ভোগী যাজক শ্রেণী

এই সময় ফ্রান্সে এক সমৃদ্ধশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। কর্মদক্ষতায় ও যোগ্যতায় তারা ছিল অভিজাতদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে ও রাজ-দরবারে তাদের কোন মর্যাদা না থাকায় তারা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

এই যুগে ফ্রান্সের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল অসহায় কৃষক ও শ্রমিক। সব দিক থেকেই কৃষকরা ছিল জমিদার ও গির্জার অধীন। এদের ওপর রাজা, রাজকর্মচারী, জমিদার ও গির্জার অত্যাচার সমানভাবে চলত। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তারা তিন ধরনের কর দিত। জমিদারকে খাজনা, গির্জাকে 'টাইথ' বা আয়ের দশমাংশ এবং রাজাকে ভূমিরাজস্ব। সপ্তাহে কয়েকদিন কৃষকরা জমিদারের জমিতে বিনা মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য থাকত। কোন কৃষকের মৃত্যু হলে তার ছেলে জমিদারকে কর না দিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও দুর্বিসহ। অল্প বেতনে ও বেশী পরিশ্রম করে এদের জীবন ধারণ করতে হত।

কৃষক ও শ্রমিক

সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের বৈষম্য এবং অবিচার ও অত্যাচারের ফলে

স্বভাবতঃই মধ্যবিত্ত ও কৃষক-মজুর শ্রেণীর মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ জেগে ওঠে। যখন ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, সে সময় ভলতেয়ার, রুশো, মণ্টেস্কু প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের লেখনীর মুখে জনসাধারণের অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। ভলতেয়ার সমাজের সব রকমের অন্যায়, অবিচার, রাষ্ট্রের ও ধর্মের সব রকমের দুর্নীতির বিদ্রূপ করে কবিতা ও নাটক রচনা করেন। গির্জার দুর্নীতিই ছিল তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। জনসাধারণকে সব অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর মত এতটা সফলকাম কেউ হননি। রুশো ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছর আগেই ফ্রান্সে এক অভূত পূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি প্রচার করেন যে মানুষ স্বাধীন সত্বা নিয়েই জন্মলাভ করে, কিন্তু মানুষ সর্বত্র পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল সেই শৃংখল ভেংগে ফেলে জন্মগত স্বাধীন সত্তা পুনরুদ্ধার করা। রুশো প্রচার করেন যে রাষ্ট্রের সব শক্তির উৎস হল জনগণ। সুতরাং জনগণের ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত না হলে রাষ্ট্রনায়ক বা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে। অপর ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কু ফ্রান্সের দুর্নীতিপূর্ণ গির্জা ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসন সংস্কারের দাবি সোচ্চার করে তোলেন। ফরাসী দার্শনিকদের রচনা ও প্রচারের ফলে দেশময় অসন্তোষের আগুন আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং সকলের অন্তরে বিদ্রোহের সুর বেজে ওঠে।

ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাব

রুশো

এ সময় আর একটি ঘটনা বিপ্লবে ইন্ধন যোগায় এবং তা হল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। বহু ফরাসী সৈন্য আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত

হয়েছিল। সেই ফরাসী সৈনিকরা স্বদেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করে নির্যাতিত ও অবহেলিত ফরাসী জনসাধারণের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। এই শ্রেণীর ফরাসী সৈনিকদের মধ্যে ল্যাফায়াতের নাম উল্লেখ করা যায়।

ষোড়শ লুই
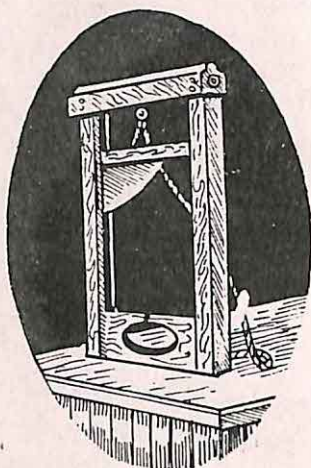
গিলোটিন যন্ত্র

ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল আরও দুইটি কারণ—স্বেচ্ছাচারী শাসন ও অর্থসংকট। ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী এবং রাজাই ছিলেন একছত্র ক্ষমতার অধিকারী। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় সব কিছুই রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতকে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও অবিচার চরমে ওঠে। পঞ্চদশ-লুই-এর পর ষোড়শ লুই ফ্রান্সের এই সংকটের সময় সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁরও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও শাসন দক্ষতা ছিল না। রাজকোষের অর্থাভাব পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। রাজদরবারের আড়ম্বর ও বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয় হত। অভিজাতরা ও যাজকরা কোন কর দিতেন না। কর-আদায়কারী কর্মচারীরা রাজকোষকে ফাঁকি দিত। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করায় ফ্রান্সের প্রচুর অর্থব্যয় হয়। ফরাসী সরকারের দারুণ অর্থের অভাব দেখা দেয়।

স্বেচ্ছাচারী শাসন ও অর্থসংকট

এই সংকটের প্রতিকারের উপায় না দেখে রাজা ষোড়শ-লুই শেষ পর্যন্ত

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস্-জেনারেল নামে ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন। স্টেটস্-জেনারেল ফ্রান্সের এক পুরাতন সংস্থা। অভিজাত, যাজক ও জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সংস্থা বা সভা গঠিত ছিল।

স্টেটস্ জেনারেল

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদে নবনির্বাচিত স্টেটস্-জেনারেলের অধিবেশন শুরু হয়। পূর্বে এই সভায় শ্রেণীগত ভাবে ভোট দেওয়ার রীতি ছিল। ফলে অভিজাত ও যাজকরা একসঙ্গে মিলে তাদের সুবিধামত যে কোনও আইন পাশ করাতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিরা অন্য দুই শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে আসন গ্রহণের দাবি করেন। রাজা ষোড়শ-লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মনোভাবে ভয় পেয়ে সভা বন্ধ করে দেন। এই অবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা কাছেই এক টেনিস-কোর্টে সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে ফ্রান্সের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভার্সাই ছেড়ে চলে যাবেন না। তাঁদের দৃঢ়তায় ভয় পেয়ে রাজা ষোড়শ-লুই জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দাবি মেনে নিয়ে অভিজাত ও যাজকদের নির্দেশ দেন জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে সভা করতে। এই সময় থেকে স্টেটস্-জেনারেল 'জাতীয়-পরিষদ' নামে পরিচিত হয়।

ভার্সাই-এ রাজা ও অভিজাত এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যে যখন বিবাদ চলছিল, সেই সময় প্যারিস শহরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, দরিদ্র শ্রমিক ও বেকারদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই অসন্তোষ জেগে উঠেছিল। রাজা জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন এই সংবাদ প্যারিসে এসে পৌঁছলে, সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে, মদের দোকান ও রুটির কারখানা লুঠ করে। প্যারিসের হাজার হাজার নাগরিক ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই শহরের মাঝখানে অবস্থিত ব্যাস্তিল দুর্গ দখল করে তা ধূলিসাৎ করে দেয়। ফ্রান্সের জনগণের কাছে ব্যাস্তিল দুর্গ ছিল অত্যাচারী শাসনের প্রতীক। ব্যাস্তিলের পতনে অত্যাচারী শাসনের অবসান হয় ও এক নতুন যুগের সূচনা হয়। আজও ফরাসীরা ১৪ই জুলাই জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করেন।

ব্যাস্তিল দুর্গের পতন ও বিপ্লবের সূত্রপাত

বিপ্লবের গতি : ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের

বিপ্লবী জনগণ নিজেদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে 'কমিউন' নামে অস্থায়ী পৌর-পরিষদ গঠন করে। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তারা 'জাতীয় রক্ষীদল' নামে এক সেনা বাহিনীও গঠন করে। প্যারিসের দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের অন্যান্য শহরও অনুসরণ করে। গ্রামের কৃষকরা অভিজাতদের বাড়ী-ঘর ভেঙে দিয়ে তাদের জমি-জায়গা দখল করে নেয়।

কমিউন

জাতীয় পরিষদ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করে। এই সংস্কারগুলোর মূল ভিত্তি ছিল তিনটি আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। বিশ্ববাসীর কাছে ফরাসী বিপ্লবের বাণী ছিল এই তিনটি আদর্শ। বিপ্লবীদের কাজকর্ম ষোড়শ লুই-এর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ছদ্মবেশে স্ব-পরিবারে দেশ থেকে পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সীমান্তে তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁকে একরকম বন্দী করেই প্যারিসে ফিরিয়ে আনা হয়।

জাতীয় পরিষদের কার্যকলাপ

রাজার পালাবার চেষ্টায় ফ্রান্সের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়। এই সময় ফ্রান্সে জ্যাকোবিন নামে চরমপন্থীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সামনে এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আসতে পারে, এই আশঙ্কায় ইউরোপের রাজারা ফরাসী বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করার সংকল্প নেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজারা ইউরোপের রাজাদের কাছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের বিপ্লব দমন করার আহ্বান জানান। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। ফরাসী বাহিনী বার বার পরাস্ত হতে থাকলে ফ্রান্সে এক দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফরাসী বিপ্লবীদের সন্দেহ হয় যে বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে রাজার গোপন ষড়যন্ত্র আছে। জাতীয় কনভেনশনে রাজার বিচার হয় এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গিলোটিন নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে রাজার শিরচ্ছেদ করা হয়। এরপরে ফ্রান্সে শুরু হয় চরমপন্থীদের তাণ্ডবলীলা। চরমপন্থীদের নেতা রোবস্‌পীয়র ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্ব বা 'রেন-অফ-টেরর'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লব-বিরোধী বলে সন্দেহজনক শত শত মানুষের বিনা বিচারে

বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপ

শিরচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু শেষে রোবসপীয়রের অত্যাচারী শাসনে সকলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং রোবসপীয়রকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হয়।

এর পর মধ্যপন্থী দল একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু করে যা 'ডাইরেক্টরী' নামে পরিচিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ডাইরেক্টরী সরকার ক্রমেই জনসাধারণের অপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের অনেকগুলো দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তি জোট গঠন করে। ফ্রান্সের এই দুর্দিনে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক অসাধারণ-প্রতিভাবান নেতার আবির্ভাব হয়।

ডাইরেক্টরী শাসন

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। তিনি প্যারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ফরাসী দার্শনিকদের আদর্শ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দেন। বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিপ্লবের শুরু থেকেই তাতে যোগদান করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বাহিনী টুঁলো বন্দর অবরোধ করলে নেপোলিয়ন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে টুঁলো রক্ষা করেন। তাঁর সামরিক জীবনের এটা হল প্রথম সাফল্য। এরপর নেপোলিয়ন ইটালীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে জয়লাভ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মিশর অভিযান সম্পন্ন করে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ডাইরেক্টরী সরকার ভেঙে দিয়ে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সের প্রধান কনসাল্ হিসাবে কিছুদিন শাসন-পরিচালনা করার পর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজতন্ত্রের আবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করেন।

নেপোলিয়ন

সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন প্রায় দশ বছর রাজত্ব করেন। এই সময় ইউরোপে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে নানা জনকল্যাণ মূলক সংস্কার সাধন করেন। তিনি ফ্রান্সের

প্রশাসনে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমতার আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁর আমলে কোন শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আর থাকল না। দীর্ঘকালের অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূর করে, তিনি এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি 'ব্যাংক-অফ-ফ্রান্স-'এর প্রতিষ্ঠা করেন, মুদ্রানীতির সংস্কার করেন, রাস্তাঘাটের সংস্কার করেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যে উৎসাহ দেন। নেপোলিয়নের সবচেয়ে বেশী গৌরবজনক সংস্কার হল আইন-সংস্কার-যা 'কোড নেপোলিয়ন' নামে খ্যাত। আইনের চোখে সকলের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তিনি শিক্ষানীতিরও আমূল পরিবর্তন করেন এবং ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

নেপোলিয়ন একে একে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করে জার্মানীর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া পরাস্ত হয়ে নেপোলিয়নের সংগে সন্ধি করে। তিনি তাঁর দুই ভাই যোসেফ ও লুই-কে যথাক্রমে ন্যাপল্‌স ও হল্যাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। স্পেন ও ডেনমার্কেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। একমাত্র ইংল্যান্ড ও রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশই নেপোলিয়নের পদানত হয়।

নেপোলিয়নের যুদ্ধ বিগ্রহ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তির প্রথম জাগরণ শুরু হয় স্পেন ও পর্তুগালে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেন ও পর্তুগালের জনগণ মরিয়া হয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করার পর ফরাসীদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। স্পেন ও পর্তুগালের এই সাফল্য জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সূত্রপাত করে।

ইউরোপের বিদ্রোহ

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি ভংগ করে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে সফল হলেও রাশিয়ার দারুণ শীতে, খাদ্যের অভাবে ও রুশ-জনগণের প্রবল প্রতিরোধের ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয় বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। এই সংবাদে উৎসাহ পেয়ে সমস্ত ইউরোপ ফরাসী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রুখে দাঁড়ায়। প্রাশিয়া রাশিয়ার সংগে যোগ দিলে ইউরোপের মুক্তি-যুদ্ধ' শুরু হয়। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করেও শেষ

পর্যন্ত ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে। তিনি সিংহাসন ও স্বদেশ ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের এল্‌বা দ্বীপে আশ্রয় নেন। পরের বছর (১৮১৫ খ্রীঃ) তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে এসে সিংহাসন দখল করেন। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো সংঘবদ্ধভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারলু-র যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন এবং তাঁকে আতলান্তিক মহাসাগরে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানেই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল

ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ইউরোপে ছিল স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীভেদ, সামাজিক বৈষম্য ও জাতীয়তাবোধের অভাব। বিপ্লবের ফলে জার্মানী ও ইটালী সমেত ইউরোপের প্রায় সব দেশেই সামন্ত প্রথার চির বিদায় ঘটে। অভিজাত, যাজক, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সকলেই রাষ্ট্রের প্রজা বলে স্বীকৃত হয়, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার এবং ধর্মের ব্যাপারে সকলের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এক কথায় ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে প্রগতিমূলক আদর্শের প্রসার ঘটে তা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রেরণা এসেছিল ফরাসী বিপ্লবের বাণী—"সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" থেকে। ফরাসী বিপ্লবের আর এক স্থায়ী ফল হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, যার সার্থক ফল হল ইটালী ও জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

অনুশীলনী

১। উত্তর আমেরিকায় কিভাবে ইংরাজ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? ইংরাজ উপনিবেশ সংখ্যায় কটি ছিল? অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে উপনিবেশগুলোর সম্পর্ক কেমন ছিল? ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ কি?

২। 'শিল্প বিপ্লব' বোলতে কি বোঝায়? কোন্ দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রথম সূচনা হয়? ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব প্রথম সূচনা হওয়ার কারণ কি? কি কি আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হয়? শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন আবিষ্কারকের নাম কর। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। কৃষি বিপ্লব সম্বন্ধে কি জান?

৩। ফরাসী বিপ্লবের কারণ আলোচনা কর। ভলতেয়ার, রুশো ও মণ্টেস্কু কে ছিলেন? ষোড়শ লুই স্টেটস্-জেনারেল কেন ডাকেন? সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়নের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

৪। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফল কি?

(১) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উন্মেষ

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম ফল হ'ল ইউরোপের প্রায় সবদেশে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উন্মেষ। প্রতিটি জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে এবং সেই রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছা অনুসারে গঠিত হবে—এই আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক ভাষা, এক কৃষ্টি ও এক ঐতিহ্য থাকলে জাতি গঠিত হয়—এই ধরনের জাতীয়তাবোধ ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ইউরোপে বেশ সাড়া জাগায়। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ স্পেন, রাশিয়া ও পর্তুগালের জনগণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রী আন্দোলন শুরু হয়। কোথাও বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও দাস-প্রথার অবসান ঘটান, কোথাও তাদের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান, আবার কোথাও বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা। উনবিংশ শতকে ইউরোপের জাতীয়তাবাদীরা শুধু যে নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করেছিল তাই নয়, তারা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাও কামনা করেছিল। ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা ম্যাৎসিনী 'তরুণ-পোল্যাণ্ড', 'তরুণ জার্মানী' ও 'তরুণ ইটালী' প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে এই সব দেশের মুক্তি-আন্দোলন জোরদার করে তুলেছিলেন। ইটালীর অপর এক প্রখ্যাত নেতা গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ-আমেরিকার জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদ বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিপ্লবীরা এক উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেও স্বৈরাচারী শাসকরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সব জায়গায় বিপ্লব ও আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের

বিরুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সমবেত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসেলরী, ফ্রান্সের মন্ত্রী টেলির্যাঁ ও অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই যে নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে ইউরোপের মানচিত্রে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তা অস্বীকার করা ও সেই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের আগের অবস্থা যতদূর সম্ভব ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ তাঁরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও বিপ্লব-প্রসূত অবস্থাকে অস্বীকার করে আবার স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিয়েনায় সমবেত নেতারা 'ন্যায্য-অধিকার'-নামে এক নীতির উদভাবন করেন। এই নীতির অর্থ ছিল এই যে দীর্ঘকাল ধরে যে রাজবংশ যে সব অঞ্চলে রাজত্ব করে আসছিলেন—সেই রাজবংশ সে সব অঞ্চলে শাসন করার একমাত্র অধিকারী হবেন। এই নীতির প্রবল সমর্থক ছিলেন মেটারনিক। তিনি ছিলেন সব রকম বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ন্যায্য-অধিকারনীতি প্রয়োগ করে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে এবং ইটালী ও জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে পুরোন রাজবংশের শাসন আবার কায়েম করা হয়। পোপও তাঁর মধ্য-ইটালীর রাজ্য ফিরে পান।

ফরাসী বিপ্লবের আতঙ্ক এই সব রাষ্ট্রনায়কদের এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে তাঁরা বিপ্লবের আগের অবস্থা ফিরিয়ে এনেই নিশ্চিন্ত থাকলেন না। তাঁরা এইসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা স্থায়ী করার জন্যও সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অগ্রণী হন। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে এক অধর্মীয় ঘটনা বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অধর্মীয় ঘটনা না ঘটে সেজন্য ঈশ্বরের কাছে রাষ্ট্রনায়ক ও রাজাদের এক মহান দায়িত্ব আছে। এই আদর্শ কার্যকর করার জন্য জার প্রথম আলেকজাণ্ডার প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাজাদের নিয়ে 'পবিত্র মৈত্রীসংঘ'-নামে এক সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা ছিল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমূলক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রুশ-জারের মৃত্যু হলে এই সংস্থার অবসান ঘটে। এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল

রাষ্ট্রবিদরা ভিয়েনায় যে সব বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা দমন করার জন্য এক ইউরোপীয় সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ ব্যাপারে অগ্রণী হন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক। তাঁর চেষ্টায় অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এক চতুঃশক্তি মিতালি বা মৈত্রী সংঘ গঠিত হয়। এই মিতালির লক্ষ্য ছিল ভিয়েনায় গৃহীত ইউরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা ; ইউরোপের শান্তি রক্ষা করা ও ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চতুঃশক্তি মিতালি

চতুঃশক্তি মিতালির প্রাণবিন্দু ছিলেন মেটারনিক। তাঁর লক্ষ্য ছিল সব রকমের বিপ্লবী ভাবধারা দমন করা, ইউরোপে বিপ্লব-পূর্ব রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষা করা। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউরোপে নবাগত বিপ্লবী প্রভাব ধ্বংস করার জন্য তাঁর সবশক্তি নিয়োগ করেন। এই কারণে এই সময়কে 'মেটারনিকের যুগ' বলা হয়। সে সময় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী নিয়ে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। মেটারনিক বিশ্বাস করতেন যে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটলে এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস ছিল সুনিশ্চিত। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার ও বিপ্লবী আদর্শ সমূলে ধ্বংস করার যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন তা 'মেটারনিক-পদ্ধতি' নামে অভিহিত। এই পদ্ধতি বা ব্যবস্থা ছিল দমনমূলক। তিনি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ছাত্র, শিক্ষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করেন ; সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন ও ইউরোপে তা দমন করতে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে মেটারনিকের সাহায্যে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা কিছুদিন তাঁদের রাজ্যে সব রকমের আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হন। কিন্তু যুগ-ধর্মের সংগে কোন রকম সামঞ্জস্য না থাকায় শেষ পর্যন্ত মেটারনিকের নীতি ও পদ্ধতি ব্যর্থ হয়।

মেটারনিক পদ্ধতি

(২) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের প্রসার

ভূমিকা : উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরম প্রকাশ ঘটে ইটালী ও জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে। 'একজাতি-একরাষ্ট্র' ফরাসী বিপ্লবের এই আদর্শের প্রভাবেই ইটালী ও জার্মানীতে দুইটি বিরাট

জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এই দুইটি দেশই বহু শতাব্দী ধরে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং এই সব রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসকরা শাসন করতেন। ফলে এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা ও কৃষ্টির ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে পারেনি। এই দুই দেশেই জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয় ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাবে এবং নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে।

ইটালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ফরাসী বিপ্লবের আগে ইটালী ছোট ছোট বারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে একমাত্র সার্ডিনিয়া পীয়েডমণ্টই ছিল স্বাধীন ইটালীয় রাষ্ট্র। বাকি সব রাষ্ট্রই ছিল বিদেশী রাষ্ট্রের শাসনাধীন, যেমন উত্তর এবং দক্ষিণ-ইটালীর নেপলস্ ও সিসিলিতে স্পেনের বুরবোঁ বংশ রাজত্ব করতেন। নেপোলিয়নের ইটালী বিজয়ের ফলে ইটালীতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। নেপোলিয়ন উত্তর ইটালী ও দক্ষিণ-ইটালীতে যথাক্রমে অস্ট্রিয়া ও স্পেনীয় বংশের উচ্ছেদ করেন এবং পোপের রাজ্যও নিজের শাসনাধীনে আনেন। তিনি ইটালীতে এক শাসন ব্যবস্থা ও এক আইনবিধি প্রবর্তন করেন এবং ফ্রান্সের অনুকরণে নানা সংস্কার সাধন করেন। এছাড়াও, নেপোলিয়ন ইটালীর অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ দূর করেন এবং ইটালীর এক জাতীয়বাহিনী গঠন করেন। এর ফলে ইটালীয়দের মধ্যে জাতীয় একতার চেতনা জেগে ওঠে ও তারা আবার ইটালীর পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভিয়েনা—বন্দোবস্তো (১৮১৫ খ্রীঃ) অনুসারে ইটালী আবার বিভক্ত, পরাধীন ও স্বৈরাচারী শাসকদের পদানত হয়। ইটালীর জনগণ এই অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তারা গণতন্ত্র, ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে।

ইটালীতে নেপোলিয়নের অবদান

এই সময় ইটালীতে দুজন খ্যাতনামা বিপ্লবী আবির্ভাব হয় যথা ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডী। ম্যাৎসিনী ছিলেন এক আদর্শবাদী জননায়ক। তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল ইটালী থেকে বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদ করে এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠন করা। দেশকে জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি 'নবীন-ইটালী' নামে এক জাতীয় দল গঠন করেন এবং

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি

এর ফলে ইটালীর সবজায়গায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে ইটালীতেও তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল উত্তর ইটালী থেকে অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা। উত্তর-ইটালীর সার্ডিনিয়া পীয়েডমণ্ট রাজ্যের রাজা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু তিনি পরাস্ত হন। এই অবস্থায় ম্যাৎসিনী ও তাঁহার সাধারণতন্ত্রী দল গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

গ্যারিবল্ডী

"রাজাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার জন যুদ্ধের পালা"—এই ঘোষণা করে ম্যাৎসিনী জনগণকে মুক্তি সংগ্রামে আহ্বান জানান। এই সংগ্রামে ম্যাৎসিনীর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন গ্যারিবল্ডি। এই দুই নেতার কঠোর সংগ্রামের ফলে রোমে ও টাস্কানীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর থেকে সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্ট রাজ্য ইটালীর জাতীয়তাবাদী ও ঐক্য-আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই রাজ্যের নতুন রাজা ভেক্টর ইমানুয়েল ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, প্রজাহিতৈষী ও সুযোগ্য শাসক। তাঁর দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য ইটালীর জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভিক্টর ইমানুয়েল এই সময় এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মন্ত্রী লাভ করেছিলেন যাঁর নাম কাভুর। কাভুরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইটালীর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন করা। কাভুর ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ম্যাৎসিনির মত তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা বলে মনে করতেন।

কাভুর ও ইটালীর ঐক্যসাধন

কাভুর নানা সংস্কার প্রবর্তন করে সার্ডিনিয়া-পীয়েডমণ্টকে এক

আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এরপর তিনি ইটালী থেকে অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করতে যত্নবান হন। কাভুর জানতেন যে একমাত্র সার্ডিনিয়ার শক্তি দিয়ে অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করা যাবে না, এর জন্য দরকার বিদেশী শক্তির সাহায্য। সে সুযোগও কাভুরের সামনে এসে পড়ে। এই সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সংগে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধে যা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৮৫৪-৫৬ খ্রীঃ)। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের আশায় কাভুর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দলে যোগ দেন। তিনি ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সংগে এক গোপন চুক্তি করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ইটালীতে আসেন ও অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে অস্ট্রিয়া সার্ডিনিয়াকে লোম্বার্ডি ছেড়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই টাস্কানী, পার্মা, মোডেনা ও উত্তর-ইটালীর পোপ-শাসিত রাজ্য সার্ডিনিয়ার সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল উত্তর ও মধ্য ইটালীর রাজা বলে ঘোষিত হন।

এর মধ্যেই দক্ষিণ-ইটালীর নেপলস্ ও সিসিলি রাজ্যে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক গণ-অভুত্থান ঘটে। কাভুরের নির্দেশে গ্যারিবল্ডি বিপ্লবীদের সাহায্য করার জন্য এক সেনাবাহিনী নিয়ে সিসিলিতে আসেন। খুব সহজেই তিনি অত্যাচারী শাসকদের পরাস্ত করে নেপলস্ ও সিসিলি মুক্ত করেন (১৮৬০ খ্রীঃ)। এই দুই রাজ্যের জনগণ স্বেচ্ছায় সার্ডিনিয়ার সংগে সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল 'ইটালীর রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও রোম ছিল পোপের দখলে। পোপকে সাহায্য করার জন্য রোমে একদল ফরাসী সেনা মোতায়েন করা ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ওপর আধিপত্যের ব্যাপার নিয়ে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাস্ত হলে ইটালীর অন্তর্গত ভেনিশিয়া ইটালী লাভ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স রোম থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নেয়। সেই সুযোগে ইটালীর সেনাবাহিনী রোম দখল করে নেয়। সেই থেকে রোম ইটালীর রাজধানী হয়। এইভাবে ইটালীর জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয় এবং সেখানে জাতীয় রাষ্ট্রের জন্মলাভ হয়।

জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

উনবিংশ শতকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আর এক সাফল্য হল জার্মানীর ঐক্যবন্ধন ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ফরাসী বিপ্লবের আগে জার্মানী প্রায় তিনশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায় লেগেই থাকত। ইটালীর মত জার্মানীতেও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাবে ও নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। নেপোলিয়ন জার্মানীর ছোট ছোট রাজ্যগুলোর অবসান ঘটিয়ে কয়েকটি বড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে জার্মানদের মধ্যে ঐক্যবোধের ও জাতীয়তাবোধের সূত্রপাত হয়।

জার্মানরা আশা করেছিল যে নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীর জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে ইটালীর মত জার্মানী সম্পর্কেও 'ন্যায্য অধিকার' নীতির প্রয়োগ করে জার্মানীকে আবার খণ্ড খণ্ড করা হয় ও এক জার্মান রাষ্ট্র-সমবায় গঠন করে তার ওপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। ভিয়েনা সম্মেলন জার্মানী সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও জার্মানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে যায়। প্রথমে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে এক শুল্ক-সংঘ গড়ে ওঠে। এই শুল্ক-সংঘ হল জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের প্রথম সোপান। এছাড়া জার্মান কবি ও ঐতিহাসিকরা জার্মান জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেন। এঁদের মধ্যে ফিস্টি, হেগেল ও স্টেইন-এর নাম করা যায়।

জার্মানীর শুল্ক সংঘ ও জাতীয় ঐক্যের প্রথম সোপান

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতেও এসে লাগে। জার্মানীর অনেক রাষ্ট্রের শাসকরা বিপ্লবীদের চাপে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে মিলিত হয়ে প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে জার্মানীর অন্য সব রাষ্ট্রের শাসকরা বিপ্লবীদের দমন করেন ও সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলো বাতিল করেন।

জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে প্রথম ব্যর্থ প্রচেষ্টা

বিসমার্ক ও জার্মানীর ঐক্য সাধন

সেসময় জার্মানীর জাতীয় ঐক্যগঠনে প্রাশিয়াই ছিল সর্বাধিক উপযুক্ত। সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে প্রাশিয়া ছিল শ্রেষ্ঠ। শুধু প্রয়োজন ছিল এক বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতার। এই সময় জার্মানীর রাজনীতিতে অটোভন বিসমার্ক-এর আবির্ভাব হয় ও সেই সঙ্গে জার্মানীর ইতিহাসে এক নতুন যুগের শুরু হয়।

ব্রান্ডেনবার্গের এক অভিজাত পরিবারে বিসমার্কের জন্ম হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কাভুরের মত বিসমার্কও বিপ্লব ও গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই ও প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির সাহায্যেই জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু অস্ট্রিয়া ছিল জার্মানীর জাতীয় ঐক্যবদ্ধনের প্রধান বাধা। সুতরাং অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন করার নীতি বিসমার্ক গ্রহণ করেন।

বিসমার্ক

বিসমার্কের তিনটি যুদ্ধ

বিসমার্ক জানতেন যে এই মহান লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে তাঁকে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। সুতরাং তিনি প্রথমেই প্রাশিয়ার সামরিক বিভাগে সংস্কার প্রবর্তন করে প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করে তোলেন। এর পর তিনি তিনটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম যুদ্ধটি হয় ডেনমার্কের সঙ্গে। এই সময় জার্মানীর দুটি প্রদেশ ডেনমার্কের শাসনাধীন ছিল। বিসমার্ক জার্মানীর এই দুটি প্রদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অস্ট্রিয়াকে কিছু ভাগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্য পান। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে ঐ দুটি প্রদেশ দখল করে। বিসমার্ক জানতেন যে এই দুটি প্রদেশের ভাগ নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধবে।

সুতরাং তা ঘটবার আগেই বিসমার্ক রাশিয়া ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা লাভ করেন। তিনি ইটালীর সংগেও এক গোপন চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে ইটালী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সাহায্য করলে ইটালীকে ভেনিশিয়া ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে বিসমার্ক তাঁর কূটনৈতিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। খুব সহজেই অস্ট্রিয়া পরাজিত হয় এবং এর ফলে ডেনমার্কের হাত থেকে সদ্য মুক্ত জার্মান-প্রদেশ দুটি (স্লেসউইগ ও হলস্টিন) এবং হ্যানোভার, হেস, ফ্রাংকফার্ট ইত্যাদি প্রাশিয়ার সংগে যুক্ত হয়। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর-জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ।

অস্ট্রিয়ার পর জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে অপর বাধা ছিল ফ্রান্স। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর-জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে ফ্রান্স অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ ফ্রান্স জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ঘোর বিরোধী ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ-জার্মানীর ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলি তখনও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সুতরাং দক্ষিণ-জার্মানীকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে ফ্রান্সের সংগে যুদ্ধের প্রয়োজন বিসমার্ক বুঝতে পারেন। তিনি কূটনীতির সাহায্যে ফ্রান্সের সংগে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলেন এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। বিসমার্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে জার্মানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে ফ্রান্সের সংগে যুদ্ধ করে। ফ্রান্স সহজেই পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের ফলে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পন্ন হয় এবং জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হয়।

জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

(৩) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর আমেরিকার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল দাসত্ব প্রথা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল শিল্পে ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে

গৃহ-যুদ্ধের কারণ

ওঠে। শিল্পের কাজে নিগ্রো দাস শ্রমিকদের অপেক্ষা স্বাধীন ইউরোপীয় শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল বেশী। এই কারণে উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো দাসত্ব-প্রথার বিরোধী ছিল। কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো ছিল কৃষি-প্রধান অঞ্চল। সেখানে আখ, তামাক, তুলা প্রভৃতির চাষ হত। এই চাষের কাজে নিগ্রো ক্রীতদাসরা খুবই দক্ষ ছিল। তাছাড়া ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষ-আবাদ করার খরচও ছিল খুব সামান্য। দক্ষিণ-অঞ্চলের কৃষি-মালিকরা মনে করতেন যে দাস-শ্রমিক ছাড়া চাষ-আবাদ সম্ভব নয়। সুতরাং দাসত্ব-প্রথার বিরোধী উত্তর-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো এবং দাসত্ব-প্রথার প্রবল সমর্থক দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। মিসৌরী-চুক্তি (১৮২০ খ্রীঃ) অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এক আপোষ-মীমাংসা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি এবং উভয়ের মধ্যে দাসত্ব-প্রথা নিয়ে বিরোধ চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের সময় একমাত্র ম্যাসাচুসেটস্ ও পেনসিলভানিয়া ছাড়া আমেরিকার সব রাষ্ট্রেই দাসত্ব-প্রথা চালু ছিল। কিন্তু ক্রমে উত্তর আমেরিকার জনমত দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠায়, আইনের সাহায্যে এই অঞ্চলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দাসত্ব প্রথা সংক্রান্ত বিরোধ

আমেরিকার দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বিরোধ আরও প্রবল হয়ে ওঠে যখন ঊনবিংশ শতকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার সম্প্রসারণ ঘটে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলো দাবি করে যে এই নতুন অঞ্চলে দাসত্ব-প্রথা চালু করা চলবে না। কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো তা মানতে রাজী হল না।

দাসত্ব-প্রথার প্রশ্ন ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধও ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার কারণে উত্তরাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সব ব্যাপারেই প্রাধান্য ভোগ করে আসছিল। এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে উত্তরাঞ্চলের আধিপত্য থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

রাজনৈতিক বিরোধ

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি উত্তর ও দক্ষিণের এই বিরোধ চরমে

ওঠে। এই সময় উত্তর আমেরিকায় 'রিপাবলিকান' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দলের প্রধান লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল আমেরিকা মহাদেশ থেকে দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের প্রার্থী হিসাবে আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লিংকন কেনটাকি প্রদেশে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (১৮০৯ খ্রীঃ)।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-পদে আব্রাহাম লিঙ্কনের নির্বাচন ও গৃহযুদ্ধ শুরু

তিনি দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিলেন না, তবে তাঁর দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ। ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততা ছিল তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ। তিনি দাসত্ব-প্রথাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে করতেন এবং তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। স্বভাবতঃই লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো আতংকিত হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা হয় যে লিংকনের প্রথম কাজই হবে দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করা। সুতরাং এই ভয়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেফারসন ডেভিস-এর নেতৃত্বে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে।

আব্রাহাম লিংকন

দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো বিদ্রোহী হলে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এক বিরাট সংকটের উদ্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়ায়। আব্রাহাম লিংকন অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সংগে সংকটের মোকাবিলা করেন। তিনি দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর নেই। ফলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর সংগে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় চার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের প্রথম দিকে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো সাফল্য অর্জন করে। তারা ছিল খুব সংঘবদ্ধ ও তাদের দুই সেনাপতি লী ও জ্যাকসন ছিলেন সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা

পরাজয় স্বীকার করে। কারণ উত্তরের রাষ্ট্রগুলো সৈন্যসংখ্যা, সমরাস্ত্র ও নৌ-শক্তির দিক থেকে ছিল বেশী শক্তিশালী। গেটিসবার্গের যুদ্ধে সেনাপতি 'লী' পরাস্ত হলে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর জয়ের সব আশা নষ্ট হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সেই সঙ্গে গৃহযুদ্ধও শেষ হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই আব্রাহাম লিংকন এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

যুদ্ধের ফলাফল

গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকা মহাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা পায়, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অবকাশ পায়। এছাড়া আমেরিকা মহাদেশ থেকে দাসত্ব-প্রথা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়, সব শ্রেণীর মানুষের স্বাধিকার স্বীকৃত হয় এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় ক্রমে শিল্পের প্রসার শুরু হয়।

(৪) ইউরোপের শিল্পায়ন (যন্ত্র সভ্যতা)

আমরা ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কথা আগেই জেনেছি। কিন্তু এই বিপ্লব শুধু ইংল্যাণ্ডের গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত থাকে নি। ইউরোপের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ইউরোপ মহাদেশেও ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছিল তা ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলো শিল্প-প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং যান্ত্রিক সভ্যতা শুরু হয়। ইউরোপের সব দেশে যে একই সময়ে শিল্পায়ন ঘটেছিল তা নয়। ইংল্যাণ্ডে এর সূচনা হয় অষ্টাদশ শতকে। ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর সূচনা হয় নেপোলিয়নের পতনের পর অর্থাৎ উনবিংশ শতকে।

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মেষ

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রী আর্করাইটের তৈরী করা যন্ত্রপাতি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রবর্তন করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শিল্পী উইলিয়াম ককরিল বেলজিয়ামে প্রথম যন্ত্রপাতি তৈরী করার শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর আলসাস প্রদেশে সুতোর কলে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রবর্তন করা হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইউরোপে যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ দ্রুত হয়। ইংরাজ পুঁজিপতি ও ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রীবিদদের সাহায্যে

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মান, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশে শিল্পের প্রসার

বেলজিয়ামে বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠে। ইংরাজ পুঁজিপতিদের সাহায্যে বেলজিয়ামে প্রথম রেলপথ তৈরী হয়।

যন্ত্রপাতি তথা শিল্পের প্রসারের দিক দিয়ে ফ্রান্স ছিল অনগ্রসর। ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত কুটির শিল্পই ফরাসীদের চাহিদা মেটাত। ফ্রান্সের অভিজাতরা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী। তাঁরা যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সমর্থক ছিলেন না। বড় বড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য ফ্রান্সে তখন প্রয়োজনীয় কয়লার অভাব ছিল। তা হলেও ধীরে ধীরে ফ্রান্সে যন্ত্রপাতি তৈরী করার কারখানা ও অন্যান্য শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। প্রথমে খনি-শিল্পের উন্নতি হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্সে নানা ধরনের শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় কয়েক হাজার এবং মার্শাই, প্যারিস, বোর্দো প্রভৃতি শহরে বহু কলকারখানা গড়ে ওঠে। ইংরাজ কোম্পানী ও ইংরাজ পুঁজিপতিদের সাহায্যে ফ্রান্সে রেলপথের প্রতিষ্ঠা হয়।

কয়লা ও লোহা পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও অনেকদিন পর্যন্ত শিল্পায়নের দিক থেকে জার্মানী অনগ্রসর ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে ইংল্যান্ড থেকে কিছু যন্ত্রপাতি জার্মানীতে আনা হয় এবং কতকগুলো কারখানা গড়ে তোলা হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের অর্থ সাহায্যে জার্মানীতে প্রথম রেলপথের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে জার্মানী ইউরোপের এক অন্যতম শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয়। ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে ও ইস্পাত তৈরী করার ব্যাপারে জার্মানী ইংল্যান্ডকেও হার মানায়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রসার শুরু হয়। সকলের শেষে রাশিয়াতে শিল্পায়নের সূচনা হয়। রাশিয়ার খনিজ সম্পদের কোন অভাব ছিল না—অভাব ছিল মূলধন ও মুক্ত শ্রমিকের। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে দাস-প্রথার বিলুপ্তি ঘটলে বিদেশী মূলধন আসতে শুরু করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রাশিয়ায় শিল্পের ও যন্ত্রের প্রসার খুব বেড়ে যায়।

শিল্পায়নের ফলাফল

যন্ত্রের ব্যবহারের সংগে সংগে শিল্পের প্রসার ঘটে। এর সাথে সাথে যন্ত্র-সভ্যতার সুফল ও কুফল দুই দেখা দেয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে জিনিষপত্রের উৎপাদন খুব বেড়ে যায় যা আগে ভাবাই যেত না। যেসব জিনিষ আগে হাতে তৈরী করা হত, তা যন্ত্র দিয়েই তৈরী করা

শুরু হয়। অল্প সময়ে বেশী পরিমাণে জিনিসপত্রের উৎপাদন শুরু হলে দাম সস্তা হয়। আগে যেসব জিনিসপত্র শুধু ধনীরাই কিনতে পারতেন, তা এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। ইউরোপে শিল্পের ক্রমোন্নতি, বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সেই সংগে রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজের ব্যাপক প্রচলন—প্রভৃতি কারণে ইউরোপের দেশগুলো একে অপরের ওপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে ইউরোপের জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক মনোভাবের উন্মেষ হয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামপ্রদ হয়। মানুষ অন্যান্য কাজে বেশী করে মন দেওয়ার সুযোগ পায়।

নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঃ মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী

যন্ত্রের ও শিল্পের প্রসারের ফলে কারখানার সৃষ্টি হয়। সেই সংগে সমাজে দুটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যথা—শিল্পপতি বা কারখানার মালিক ও শ্রমিক। সামান্য মজুরীর আশায় ভূমিহীন চাষী ও বেকার লোকেরা দলে দলে নতুন শিল্প-শহরে ভীড় করে। কারখানাকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর নোংরা বস্তিতে বাস করতে হত। শিল্পপতিদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কম মজুরীতে শ্রমিকদের খাটিয়ে লাভের অংক বাড়ানো। কাজের তুলনায় শ্রমিকদের সংখ্যা বেশী থাকায় মালিকদের ইচ্ছেমত শ্রমিকদের মজুরী নিতে হত। শ্রমিকদের চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল না। মালিকরা যখন-তখন শ্রমিকদের ছাঁটাই করতেন।

সমাজতন্ত্রবাদ ঃ মার্কস্ ও এঙ্গেলস্

ক্রমে কিছু মানবতাবাদী সংস্কারকদের চেষ্টায় উনবিংশ শতকে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু আইন রচনা করা হয়। কারখানায় শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা হয় এবং নারীদের নিয়োগও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেই সংগে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারও দেওয়া হয়। কারখানা-প্রথার ত্রুটি দূর করার ও শ্রমিকদের কল্যাণের প্রয়োজন থেকে ইউরোপে এক নতুন মতবাদের উদ্ভব হয় যা সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন কার্ল মার্কস্। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস্ জার্মানীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলে তাঁকে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ফ্রান্সে আসেন

এবং সেখানে এংগেলস্ নামে জার্মানীর আর এক খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রীর বন্ধুত্ব লাভ করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মতবাদ ফরাসী সরকার পছন্দ না করায়, তিনি ব্রাসেলস্-এ আসেন। ব্রাসেলস্-এ থাকাকালে এংগেলস্-এর সহযোগিতায় মার্কস তাঁর বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট-ম্যানিফেস্টো'-নামে এক ইস্তাহার প্রচার করেন। মার্কস্ তাঁর প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদকে 'সাম্যবাদ' নামে অভিহিত করেছেন। মার্কসের মতে ধনী মালিক শ্রেণী ও দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য এবং এর ফলে এক শ্রেণীহীন সমাজের জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তিনি এ কথাও প্রচার করেন যে মালিকদের অর্থ-সম্পদ শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফল, সুতরাং শ্রমের মাপকাঠি দিয়েই অর্থের ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়া উচিৎ। ইউরোপের দেশগুলোর শ্রমিক-আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করার প্রথম চেষ্টা করেন মার্কস ও এংগেলস্।

কার্ল মার্কস্

অনুশীলনী

১। উনবিংশ শতকে ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি কি ছিল ?
২। উনবিংশ শতকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ?
৩। মেটারনিক কে ছিলেন ? 'মেটারনিক-পদ্ধতি' বলতে কি বোঝায় ?
৪। ইটালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। ইটালীর ঐক্য সাধনে ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদান কি ছিল ?
৬। জার্মানীতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কিভাবে হয় ?
৭। জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৮। বিসমার্ক কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে জার্মানীর ঐক্যসাধন করেন ?
৯। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলাফল কি হয়েছিল ?
১০। আব্রাহাম লিঙ্কন সম্বন্ধে কি জান ?
১১। ইউরোপের শিল্পায়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১২। কারখানা প্রথা সম্বন্ধে কি জান ? এই প্রথার কুফল বর্ণনা কর।
১৩। ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম উদ্যোক্তা কে ছিলেন ? তাঁর মতাদর্শ কি ছিল ?

(১) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ

চীনে বিদেশীদের আগমন

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে চীন প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল। চীনেরা নিজেদের দেশকে প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান বলে মনে করত। তারা নিজেদের অতীত যুগের সভ্যতা সম্পর্কে খুবই গর্ববোধ করত এবং বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসার কোন প্রয়োজনই তারা স্বীকার করত না। পঞ্চদশ শতক থেকে নতুন নতুন জলপথের আবিষ্কার হলে ইউরোপের বণিকরা চীনে ব্যবসা করতে আসে। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজরা চীনের দক্ষিণ উপকূলে মাকাও দ্বীপ দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। পর্তুগীজদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে সপ্তদশ শতকে ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরা চীনের ক্যান্টন বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিকরা চীনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তার কারণ ছিল এই যে চীনে ইউরোপীয় পণ্য সামগ্রীর বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না এবং চীন সরকার এদের ঘৃণার চোখেই দেখতেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই চীনে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ লাভজনক হয়ে উঠতে থাকে। এই কারণে ইউরোপীয়রা চীন-সরকারের খেয়াল-খুসীর ওপর নিজেদের লাভজনক ব্যবসা ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী হল না। ফলে চীন সরকারের সংগে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়। এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল ইংরাজ বণিকরা। চীনে ইংরাজদের আফিং-এর ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। তারা চোরাপথে ভারত থেকে চীনে আফিং চালান দিত এবং চীন থেকে চা, রেশম ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেত। চীনাদের মধ্যে আফিং-এর আমদানি যতই বেড়ে যেতে থাকে, চাহিদাও ততই বেড়ে যায়। চীনাদের মধ্যে আফিং-এর নেশা ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়ায় এর কুফল সম্বন্ধে চীন সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই কু-অভ্যাস থেকে চীনাদের মুক্ত করার জন্য চীন-সম্রাট আফিং আমদানি বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু চীনাদের মধ্যে আফিং-এর নেশা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাদের গোপন সাহায্যে ইংরাজরা এই ব্যবসা চালিয়ে যায়। শেষে চীন-সম্রাটের

আফিং যুদ্ধ বা প্রথম চীন যুদ্ধ

আদেশে লিন নামে এক কর্মচারী ক্যাণ্টন বন্দরে ইংরাজদের প্রায় কুড়ি হাজার বাক্স আফিং পুড়িয়ে দেন ও তাদের আফিং-এর গুদামগুলো নষ্ট করে ফেলেন। ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাধে যা প্রথম চীন যুদ্ধ বা আফিং-এর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে চীনারা হেরে যায় ও ইংরাজদের সঙ্গে নানকিং-এর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (১৮৪২ খ্রীঃ)। এর শর্ত অনুসারে ইংরাজরা হংকং দ্বীপ লাভ করে ও দক্ষিণ-চীনের পাঁচটি বন্দরে (যথা ক্যাণ্টন, ফুচো, নিংপো, অ্যাময় ও সাংহাই) তারা অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করে। আফিং ব্যবসাকে উপলক্ষ্য করে এই যুদ্ধ হলেও, নানকিং-এর সন্ধিতে আফিং-এর উল্লেখ ছিল না।

প্রথম চীন যুদ্ধ

প্রথম চীন যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই চীনের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের আবার নূতন করে বিবাদ বাধে। চীন সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ প্রচারের অপরাধে এক ফরাসী ধর্মপ্রচারককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে ফরাসীরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৭ খ্রীঃ)। সে বছরেই এক ইংরাজ জাহাজে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে জাহাজের কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়া হলে ইংরাজরাও যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ নামে পরিচিত। চীন আবার হেরে যায় ও টিয়েন সিনের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (১৮৬১ খ্রীঃ)। এর শর্ত অনুসারে চীন সরকার রাজধানী পিকিং-এ বিদেশী দূতদের স্থান দিতে রাজী হন ও আরো এগারটি বন্দর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য খুলে দেন। সেই সংগে চীনে বিদেশীদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া হয়। এর অর্থ হল এই যে, যে সব বন্দরে বিদেশীরা বসবাস করবে, সেখানে তাদের নিজেদের পৌর শাসন ও আদালত থাকবে ; বিদেশীরা এইসব এলাকায় অপরাধ করলে তাদের বিচার হবে নিজেদের আদালতেই ; নিজ নিজ এলাকায় তারা রেলপথ তৈরী করার ও খনিগুলো ব্যবহার করার অধিকার পাবে।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ
টিয়েন সিনের সন্ধি

বিদেশীদের অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংরাজকে হত্যা করার অপরাধে 'চিফু-বন্দোবস্ত'- নামে এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে চীন সরকারকে বাধ্য করা হয়। এর শর্ত অনুসারে চীনের আরও কয়েকটি বন্দরে ইংরাজরা বাণিজ্য করার নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

চীনের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা চীনের রাজ্য গ্রাস করতে মত্ত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। রাশিয়া আমুর নদী পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চল দখল করে।

চীনে বিদেশীদের রাজ্যগ্রাস

পরে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বন্ধু হিসাবে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার কিছু অংশ লাভ করে। ফ্রান্স বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে এবং ইন্দোচীন, আনাম ও টংকিন দখল করে। জার্মানী কিয়াও-চাও বন্দরটি দখল করে ; জাপান ফু-চু দ্বীপপুঞ্জ দখল করে এবং ইংল্যান্ড চীনের উত্তর উপকূলে ওয়ে-হাই-ওয়ে দখল করে। চীনের এই রাজ্যগ্রাসকে বলা হয় 'চীনা খরমুজের ছেদন'।

রাজ্য গ্রাস করার সংগে সংগে চীনে ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক শোষণও শুরু হয়। ইংরাজদের ব্যবসা প্রায় দশ গুণ বেড়ে যায়। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশ চীনের কাছ থেকে নানা ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। চীনের জলপথগুলোর ওপর ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া চীনের বাণিজ্য শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগও বিদেশীদের হাতে চলে যায়।

চীন সাম্রাজ্যের ভাগাভাগিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোন অংশ গ্রহণ করে নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনে সব দেশের সমান সুযোগ-সুবিধার সমর্থক ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে প্রাচ্যে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলে চীনের ব্যাপারে আমেরিকা আর উদাসীন থাকতে পারল না। তাছাড়া চীনের বহু অঞ্চল ও বন্দর

হে-র 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি'

ইউরোপীয়দের হাতে চলে যাওয়ায় আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। চীনে বক্সার আন্দোলনের পর চীনের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সময় চীনদেশ ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রায় ভাগাভাগি হয়ে যেত। একমাত্র আমেরিকার প্রতিবাদেই তা বন্ধ হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব জন হে চীন সাম্রাজ্যে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' প্রয়োগ করার প্রস্তাব করে ঘোষণা করেন (১৯০১ খ্রীঃ) যে চীনকে ভাগ করে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা চলবে না ; চীনে সব দেশের সমান বাণিজ্যের অধিকার থাকবে এবং চীনের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। রাশিয়া ছাড়া আর সব দেশেই হে-র প্রস্তাবিত নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটেন ও জার্মানী ঘোষণা করে যে তারা চীনের দুরাবস্থার

সুযোগ নিয়ে নিজেদের উপনিবেশ বিস্তার করবে না ও কেউ তা করলে তারা মিলিতভাবে বাধা দেবে। ফলে চীন সাম্রাজ্যের নিশ্চিত ভাঙ্গন বন্ধ হয়।

চীনের প্রতিক্রিয়া

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপের দেশগুলো চীন সাম্রাজ্যে যখন নিজেদের এলাকা একের পর গড়ে তুলেছিল, সে সময় চীনের ভিতরে এক দারুণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদের জন্য 'তাই-পিং' বিদ্রোহ নামে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় (১৮৫১-৬৪ খ্রীঃ)। তাই-পিং-এর অর্থ হল 'যথার্থ শান্তি'। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের অধিবাসী হাং-সিউ-চুয়ান্। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি ক্যাণ্টনের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজকদের কাছ থেকে খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের অনুকরণে এক নতুন ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হন। তিনি নিজেকে 'স্বর্গীয় রাজা' বলে ঘোষণা করেন এবং চীনে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। প্রথমে ধর্ম-আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন মাঞ্চু রাজবংশ-বিরোধী এক রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চীনে 'যথার্থ-শান্তি' নামে এক নতুন বংশের প্রতিষ্ঠা করা অল্প সময়ের মধ্যে হাং-এর আদর্শ দক্ষিণ-চীনে জনপ্রিয়তা লাভ করে। হাং তাঁর দলবল নিয়ে উত্তর চীনের দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং নানকিং দখল করে সেখানে নিজের রাজধানীও স্থাপন করেন। সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাং-এর যুদ্ধের ফলে সর্বত্র এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের অনেকেই বেশী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় তাই-পিং বিদ্রোহীদের সাহায্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা চীন সরকারকেই সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদেশীদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিগুলো চীনের অনুকূলে পুনর্বিবেচিত হতে থাকলে ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গে সায় দিয়ে মাঞ্চুবংশের পক্ষ সমর্থন করে। বিদেশীদের সাহায্যে মাঞ্চু সরকার তাই-পিং বিদ্রোহ দমন করেন।

তাই-পিং বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু বংশের দুর্বলতা প্রমাণিত হয় এবং ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়।

শত দিনের সংস্কার (১৮৯৮ খ্রীঃ)

চীন সাম্রাজ্যে বিদেশীদের দৌরাত্ম্য চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয়, চীন সরকারের অপদার্থতা প্রভৃতি নানা কারণে চীনের জনগণের মনে এক দারুণ হতাশা জাগে। তাদের মনে এই ধারণাই জাগে যে বিদেশীদের শোষণ ও আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে দেশকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই ধারণা থেকে দক্ষিণ-চীনে এক সংস্কারকামী দলের উদ্ভব হয়। ক্যাণ্টনের বিপ্লবী নেতা সান-ইয়াৎ সেন নামে এক ডাক্তার পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংস্কার প্রবর্তনের জন্য এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেন (১৮৯৫ খ্রীঃ)। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এর পর সংস্কার আন্দোলনের নেতা হন কাং-ইউ-ওয়ে। তিনি সান-ইয়াৎ সেনের মত উগ্রপন্থী ছিলেন না। তিনি প্রশাসনের ত্রুটিগুলো দূর করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গঠন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এদিকে চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) চীনের পরাজয় হলে চীন সম্রাট কোয়াং-সু ও সংস্কারের প্রয়োজন বুঝতে পারেন। এরই মধ্যে কাং-ইউ-ওয়ে-র সংগে সম্রাটের দেখা হয়। দুজনেরই দৃষ্টিভংগী এক হওয়ায় সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কতকগুলো সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। যথা—শিক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার, বিদেশী বই-পত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য এক অনুবাদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা, অপ্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগগুলোর বিলুপ্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য নতুন নতুন স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

চীনের প্রথম অভ্যন্তরীণ সংস্কার

কিন্তু প্রথম থেকেই রক্ষণশীল গোষ্ঠী সম্রাটের প্রগতিশীল কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এদের সহযোগিতা করেন বিধবা সম্রাজ্ঞী জু-সি। তাঁর প্ররোচনায় রক্ষণশীল গোষ্ঠী দুর্নীতি-পরায়ণ সমর-নায়কদের সাহায্যে সম্রাটকে বন্দী করে ও সংস্কারপন্থীদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় ও বহু লোককে হতাহত করে। ফলে সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়। প্রায় শতদিন ধরে সংস্কারের কাজ চলেছিল বলে এই সময়কে শতদিনের সংস্কার বলা হয়।

প্রথম সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা

সংস্কার আন্দোলন দমন করে চীনের বিধবা সম্রাজ্ঞী জু-সি সম্রাট কোয়াং-সুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা দখল করেন।

এই সময় রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রচার করতে থাকে যে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন না করলে চীনের মুক্তিলাভের কোন আশা নেই। বিধবা সম্রাজ্ঞী রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে নিজের ক্ষমতা ও মাঞ্চু বংশকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী হন। তিনি এক অনুশাসন জারী করে সম্রাট কোয়াং-সু-র প্রবর্তিত সংস্কারগুলো বাতিল করেন এবং সব রকমের বিপ্লবী সংঘ ভেঙ্গে দেন। ফলে বিদেশীদের ওপর রক্ষণশীলদের আক্রমণ শুরু হয়।

বক্সার বিদ্রোহ

চীনের রক্ষণশীলরা প্রচার করতে থাকে যে চীনের দুর্দশার জন্য ইউরোপীয়রাই একমাত্র দায়ী। ইউরোপীয়দের প্রতি এই ঘৃণা থেকে আত্মপ্রকাশ করে 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৯০০ খ্রীঃ)। মুষ্টি-যোদ্ধার ভ্রাতৃসংঘ নামে এক সংঘ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল বলে এই বিদ্রোহ 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। চীনের বহু অঞ্চলে বক্সার বিদ্রোহ শুরু হয়। বহু বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। "বিদেশীদের ধ্বংস করে সাম্রাজ্য রক্ষা কর"—এটাই ছিল বিদ্রোহীদের একমাত্র প্রচার। বিদ্রোহীরা পিকিং ও টিয়েনসিন দখল করে। প্রায় দেড় মাস ধরে বিদ্রোহীদের ধ্বংস ও হত্যালীলা চলার পর ইউরোপীয় দেশগুলোর এক মিলিত বাহিনী বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহের ফলে চীন-সরকার ইউরোপীয়দের প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন; উত্তর-চীনে বিদেশী সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হয় এবং চীন-সরকার বিদেশী বণিকদের আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হন।

সংস্কারের নতুন প্রচেষ্টা

বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় সংস্কার-বিরোধী ও বিদেশী-বিরোধী গোষ্ঠী নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বিদেশীদের শক্তি দেখে রক্ষণশীল গোষ্ঠীও অনুভব করে যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার ভিন্ন চীনের দুরাবস্থা দূর করা সম্ভব নয়। এদিকে ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সাফল্য দেখে চীনবাসীদের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয়। তারা সংস্কারের দাবি করতে থাকে। এই অবস্থায় বিধবা সম্রাজ্ঞী সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করে মাঞ্চুবংশকে রক্ষা করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহ দেন ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ইউরোপের শাসন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য এক কমিশন ইউরোপে পাঠান হয়। চীনে আফিং-ব্যবসা বন্ধ করা হয়। এছাড়া বিধবা সম্রাজ্ঞী জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মাঞ্চুবংশ কোনও রকমে টিকে থাকে।

চীনের গণবিপ্লব (১৯১১ খ্রীঃ)

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে এক নাবালক চীনের সিংহাসনে বসেন। নাবালক সম্রাটের অভিভাবক পরিষদের গঠন কেমন হবে তাই নিয়ে দেশে দলাদলি শুরু হয়। এই সময় দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টন নগরে ডাক্তার সান-ইয়াং সেনের নেতৃত্বে এক প্রবল সাধারণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে ভয় পেয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সরকার এক জাতীয় পরিষদ আহ্বান করে সংসদীয় শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেন। কিন্তু সাধারণতন্ত্রীগণ মাঞ্চু সরকারের সংগে কোন রকমের আপোষ করতে রাজী হন না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা নানকিং শহর দখল করে সেখানে এক অস্থায়ী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অবস্থায় চীনের নাবালক সম্রাট নিজে থেকেই সিংহাসন ত্যাগ করেন। ফলে সাধারণতন্ত্রীদের জয় হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় এবং সান-ইয়াং-সেন প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ভাবে চীনে প্রথম গণবিপ্লব সম্পন্ন হয়।

সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরেও চীনে গৃহবিবাদ চলতে থাকে। মাঞ্চু বংশের পতনের পর আধিপত্য চলে যায় কয়েকজন সামরিক নেতার হাতে। ঐই অবস্থায় ডাঃ সান-ইয়াং-সেন দেশের স্বার্থে সামরিক নেতাদের সংগে আপোষে মীমাংসা করেন। তিনি স্বেচ্ছায় সভাপতির পদ ত্যাগ করে ইউয়ান-সি-কাই নামে মাঞ্চু সম্রাটদের এক সুদক্ষ সেনাপতিকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করেন।

(২) জাপানের অভ্যুদয় (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানের অভ্যুত্থান-বিশ্বের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদেশীদের সংগে

চীনের মত জাপানেরও কোনও সম্পর্ক ছিল না। মধ্যযুগের ইউরোপের মত জাপানেও সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। 'মিকাডো' বা সম্রাট নামেমাত্র সব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সোগুন' উপাধিধারী এক অভিজাত পরিবারের হাতেই রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। সোগুনই ছিলেন দেশের যথার্থ শাসনকর্তা ও সম্রাটের প্রধান কর্মচারী। ইয়েডো শহরে তাঁর প্রাসাদ ছিল রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। সোগুনের পরেই ছিল 'ডাইমিও' বা সামন্তরা। এঁরা স্বাধীনভাবেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। সামন্তদের অনুচরদের বলা হত সামুরাই। এরা ছিল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। সাধারণ-শ্রেণীর লোকেরা সব রকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

জাপানের পুরোনো সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

চীনাদের মত জাপানীরাও বিদেশীদের ঘৃণার চোখে দেখত ও তাদের সংগে সব রকমের সম্পর্ক বর্জন করে চলত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতক থেকে পর্তুগাল, স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের বণিকরা জাপানে আসে এবং সেই সংগে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা দলে দলে আসতে আরম্ভ করেন। কিছু জাপানী খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে জাপানে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জাপানীদের আশংকা হয় যে ধর্ম প্রচারের সুযোগ নিয়ে একদিন বিদেশীরা হয়ত তাদের দেশ দখল করে বসবে। সুতরাং জাপানে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এই অবস্থা চলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পেরী নামে আমেরিকার এক নৌ-সেনাপতি কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে জাপানে আসেন। সে সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বাণিজ্যের প্রসার ঘটছিল। এই বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমেরিকার পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে এক নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পেরী জাপানে আসেন ও জাপানের বন্দরে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার দাবি করেন। পরের বছর তিনি আবার অনেকগুলো যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে জাপানে আসেন ও একই দাবি আবার করেন। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেই জাপানের শাসক (সোগুন) আমেরিকার সংগে সন্ধি করেন ও জাপানের বন্দরে আমেরিকার জাহাজ প্রবেশ করার অনুমতি দেন। জাপানের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায়,

জাপানের দ্বার উদ্ঘাটন

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য বিদেশীরাও জাপানের কাছ থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়।

পাশ্চাত্যের এই আঘাত জাপানের পক্ষে শুভ হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোর সামরিক শক্তিতে ভয় পেয়ে জাপান বুঝতে পারে যে বিদেশীদের হাতে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সোগুন পরিবারের হাত থেকে সম্রাটকে মুক্ত করা হয়; সোগুন, ডাইমিও ও সামুরাইদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় এবং সম্রাট মুৎসুহিটোকে স্বগৌরবে ইয়েডো নগরে নিয়ে এসে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা হয়। তাঁর রাজত্বকালকে 'মেজি' নামকরণ করা হয়। এই সময় থেকে জাপানে 'মেজি' যুগের সূচনা হয়। বিনা রক্তপাতে এই বিপ্লব ঘটেছিল বলে তা জাপানের ইতিহাসে 'পুনঃস্থাপন' (**Restoration**) নামে খ্যাত। এই বিপ্লবের ফলে সম্রাট রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ফিরে পান।

জাপানের বিপ্লব

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর জাপানীরা বুঝতে পারে যে দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। সুতরাং এর পর শুরু হয় কেন্দ্রীয়করণ আন্দোলন। সোগুনের পদ তুলে দেওয়া হলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ সহজ হয়। পশ্চিম জাপানের অভিজাতরা স্বেচ্ছায় নিজেদের পদাধিকার ও জমিদারি সম্রাটকে সমর্পণ করেন। সামুরাইরাও তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলো ত্যাগ করে। এই ভাবে জাপানে সামন্ত প্রথার বিলোপ হয়, সমাজে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয় এবং রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা সম্রাটের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

জাপানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়-করণ

এর পর শুরু হয় জাপানের পাশ্চাত্যীকরণ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে জাপান পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে হার মানায়—এমনই ছিল নিখুঁত অনুকরণ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার অনুকরণে জাপানে এক নতুন সংবিধান চালু করা হয়। এই সংবিধানে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা পবিত্র ও অলঙ্ঘণীয় বলে ঘোষণা করা হয়। সম্রাটকে

জাপানের পাশ্চাত্যী-করণ

সাম্রাজ্যের প্রধান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়। শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত এক সংস্থা বা 'ডায়েট' গঠন করা হয়। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার অনুকরণে নতুন আইন রচনা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয় এবং শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষার সব স্তরেই ইংরাজী ভাষা আবশ্যিক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করা হয়। দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইউরোপীয় বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। খ্রীষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে সব রকমের বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়।

জাপানের অর্থনৈতিক জীবনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ এবং বাষ্পীয় জাহাজ ও কারখানা স্থাপন করা হয় এবং পুরোনো বন্দরগুলোর সংস্কার করা হয়। খনিগুলোর উন্নয়ন করা হয়। সামুরাই ও অন্যান্য অভিজাতদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। আগের যুগের শিল্প-সংঘগুলো ভেঙে দিয়ে নতুন নতুন বণিক সংঘ গড়ে তোলা হয়। প্রজাস্বত্ব আইন রচনা করে কৃষকদের জমির মালিকানা দেওয়া হয়। মুদ্রানীতির সংস্কার করা হয় ও ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

একই সংগে পাশ্চাত্যের অনুকরণে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। সামরিক বিভাগকে জাতীয়করণ করা হয় এবং সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাশিয়ার অনুকরণে জাপানের সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে জাপানে একটি নৌ-বাহিনীও গঠন করা হয়।

পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুকরণ করে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হলেও একথা মনে রাখতে হবে যে জাপান কখনও তার জাতীয়ত্যবোধ বিসর্জন দেয় নি। নিজের জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বত্বাকে বজায় রেখেই জাপান প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেছিল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদ

জাপান যে শুধু পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিল্প, বিজ্ঞান ও সামরিক কলা-কৌশলই শিখেছিল তা নয়, সেই সংগে জাপান পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও গ্রহণ করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূলে ছিল রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক কারণ। আমরা দেখেছি যে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পাশ্চাত্যের দেশগুলো জোর করে জাপানে প্রবেশ করে জাপানকে তাদের সংগে কতকগুলো অসম-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। স্বভাবতঃই জাপান এই সব চুক্তিগুলো বাতিল করার দাবি করে। কিন্তু তাতে কিছু ফল না হওয়ায় জাপান বুঝতে পারে যে শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সুতরাং আত্মমর্যাদা ও আত্মরক্ষার জন্য জাপান এক বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে। এদিকে জাপানে জনসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে ও শিল্পেরও বিস্তার ঘটতে থাকে। শিল্পের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন হয়—যা জাপানে পর্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং বহির্বিশ্বে উদ্বৃত্ত জাপানীদের বসবাসের জন্য, শিল্পের কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য ও শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রী করার জন্য জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করে।

প্রথমেই জাপানের দৃষ্টি পড়ে চীনের অন্তর্গত কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার ওপর। সাম্রাজ্য বিস্তার করা ছাড়াও বিদেশীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাপান কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দমন করার জন্য চীন সেখানে সৈন্য পাঠায়। জাপান এর প্রতিবাদ করে নিজের সৈন্য সেখানে পাঠায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জাপানের সংগে চীনের যুদ্ধ বাধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে চীন পরাস্ত হয়। যুদ্ধের ফলে কোরিয়াকে স্বাধীন বলে স্বীকার করা হয়; জাপান প্যাসকাডোর দ্বীপপুঞ্জ, ফরমোসা ও লিয়াও-টাং লাভ করে ও সেই সংগে চীনে বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধাও লাভ করে।

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় অধ্যায় হল রুশ-জাপানী যুদ্ধ। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করে কোরিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে জাপান আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই সময় সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংল্যান্ডও ভয় পেয়ে যায়। সুতরাং রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ও জাপান এক মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের প্রাধান্য বিস্তারের মূলে ছিল এই মৈত্রী-চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে ইংল্যান্ড জাপানকে এক অন্যতম শক্তি হিসাবে স্বীকার করে নেয় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর আগে সমতার ভিত্তিতে এশিয়ার কোনও

রুশ-জাপানী যুদ্ধ

ইংগ-জাপান মৈত্রী

দেশের সংগে ইংল্যান্ড এই ধরনের মৈত্রী স্থাপন করেনি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াকে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করলে রুশ-জাপানী যুদ্ধ বাধে (১৯০৪-৫ খ্রীঃ)। রাশিয়া শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়। রাশিয়া জাপানের সংগে পোর্টসমাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এর শর্ত অনুসারে রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করে নেয় ও মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় জাপানের মর্যাদা বেড়ে যায়।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় অধ্যায় হল কোরিয়া দখল। রুশ

কোরিয়া দখল

জাপানী যুদ্ধে জয়লাভ করায় জাপানের লোভ আরও বেড়ে যায়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে নিজের সাম্রাজ্যভূক্ত করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নগ্নমূর্তি দেখা যায়। এই যুদ্ধে ইউরোপের দেশগুলো ইউরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে জাপান চীনে জার্মান অধিকৃত সাণ্টুং প্রদেশটি দখল করে নেয় ও চীনের কাছে একুশ দফা দাবি পেশ করে (১৯১৫ খ্রীঃ)। এই দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান দাবি ছিল সাণ্টুং, মাঞ্চুরিয়া ও মংগোলিয়ায় জাপানের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হবে ; জাপানকে কয়লা ও লোহা সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং চীন সাম্রাজ্যের কোন অংশ, বন্দর ও উপকূল অঞ্চল অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা চলবে না। যুদ্ধের হুমকি দেখিয়ে জাপান তার বেশীর ভাগ দাবি আদায় করে নেয়।

অনুশীলনী

১। চীনে ইউরোপীয়দের আগমন সম্বন্ধে কি জান ? ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কবলে চীনের কি অবস্থা হয়েছিল ?

২। প্রথম চীন যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ? দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের কারণ কি ?

৩। সান-ইয়াৎ-সেন ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীনের গণ-বিপ্লব সম্বন্ধে কি জান ?

৪। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জাপানের নবজাগরণ সম্বন্ধে কি জান ?

৫। যা জান লেখ : (ক) 'মেজি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা' (খ) জাপানের পাশ্চাত্ত্যীকরণ (গ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদ (ঘ) রুশো-জাপানী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত (১৮৫৮-১৯১৪) | একাদশ অধ্যায়

নতুন শাসন-ব্যবস্থা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহের অবসান হলে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। কোম্পানীর আমলে ভারতে এক ব্যাপক শাসনযন্ত্র গড়ে উঠেছিল যার ভিত্তি রচনা করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। মহাবিদ্রোহের পরে ভারতের যে শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর কোথাও নেই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন আইন পাশ করে। এই আইনে বলা হয় যে এখন থেকে ভারতের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের রাজার হাতে আসবে; ইংল্যাণ্ডের রাজার তরফে ভারত-সচিব নামে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী ও তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টা ভারতের শাসনকাজ চালাবেন, ভারতের বড়লাট এখন থেকে ভাইসরয় বা রাজার প্রতিনিধি বলে পরিচিত হবেন এবং তিনি ভারত-সচিবের নির্দেশ অনুসারে শাসন পরিচালনা করবেন। ভারত-সচিব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ায় তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন।

ভারতীয় শাসনের উপর ইংল্যাণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব স্থাপন

এই আইনে ভারতের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব চূড়ান্ত করা হয়। এই আইনে ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদে কোন ভারতীয় সভ্য নেওয়া হয়নি ও ভারতীয়গণকে শাসনকাজে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগও দেওয়া হয়নি।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন অনুসারে ভারতে বড়লাটের পরিষদকে দুভাগে ভাগ করা হয় যথা শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ। শাসন পরিষদের কাজ হল শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে বড়লাটকে পরামর্শ দেওয়া ও আইন-পরিষদের কাজ হল আইন রচনা করা। শাসন পরিষদের সভ্যদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। এই সভ্যরা নিজের নিজের দপ্তরের কাজকর্মের জন্য বড়লাটের কাছে দায়ী থাকেন। বড়লাটের আইন পরিষদের সভ্যদের মোট সংখ্যার অর্ধেক বে-সরকারী ভারতীয়কে মনোয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই আইন পরিষদ ছিল নিছক এক উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র। এর সভ্যরা কেবলমাত্র আইন রচনা করতে পারতেন; কোন বিতর্ক বা প্রশ্ন তুলে সরকারকে বিব্রত করার অধিকার

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

তাঁদের ছিল না। সরকারের অগ্রিম অনুমতি ছাড়া আইন পরিষদে কোন রকমের অর্থসংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন বা আলোচনা করার অধিকার সভ্যদের ছিল না। সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর আইন পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এক কথায় শাসন পরিষদের উপর আইন পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ছিল না। আইন পরিষদের একমাত্র কাজ ছিল সরকারের সব রকমের বিধি-ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করে যাওয়া। শাসন কাজের সুবিধার জন্য কোম্পানীর আমলে ভারতকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে 'প্রেসিডেন্সী' বলা হত। প্রতিটি প্রদেশের শাসন ভার একজন গভর্নর ও তাঁর পরিষদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্ব-শাসনের অধিকার ভোগ করতেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মত আইন-সভা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও গঠন করা হয়। পরে তা অন্যান্য প্রদেশেও করা হয়। প্রদেশের আইন-সভাগুলো ছিল নিছক উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র। প্রদেশের আইন-সভায় সরকারী কর্মচারী ছাড়াও কিছু বে-সরকারী ভারতীয় ও ইংরাজ সদস্য নেওয়া হয়। প্রদেশের আইন-সভাগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল গভর্নর বা ছোটলাটদের।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারতে কেন্দ্রীয়করণ-নীতির ভিত্তির ওপর শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারই ছিলেন সর্বশক্তিমান এবং প্রদেশের সরকারগুলো ছিলেন কেন্দ্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে ও প্রদেশের আইন সভায় কিছু কিছু সরকারের মনোনীত সদস্য নেওয়া হত বটে, কিন্তু শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের কোন ভূমিকা ছিল না।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে স্বায়ত্ত শাসনের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রতিটি জেলায় কিছু কিছু স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থা গঠন করা হয়। এই সব সংস্থায় কিছু মনোনীত ভারতীয় সদস্য নেওয়া হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটরাই এই সব সংস্থার সভাপতি হতেন। বড়লাট লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। লর্ড রিপনের লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে ভারতবাসীকে শাসন-

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা

সংক্রান্ত ব্যাপারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাশ করা হয়। এর দ্বারা শহরের পৌর-সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়ান হয় এবং জেলা-বোর্ড ও লোকাল-বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডগুলোর হাতে স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইসব বোর্ডে বে-সরকারী সদস্যদের সংখ্যা বেশী করা হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার আর করা হবে না। এই ঘোষণা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করেন বটে, কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তারের চেষ্টা চলতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্থান এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভূটান, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিদেশী রাজ্যগুলো ইংরাজদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এই আশংকা ইংরাজদের ছিল। সুতরাং এই দুই সীমান্তে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ব্রিটিশদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দেশ ভূটানের সংগে সীমান্ত-সমস্যার উদ্ভব হয়।

ভূটান

এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক ইংরাজ দূতকে ভূটানে পাঠান হয়। কিন্তু এই দৌত্য ব্যর্থ হলে একদল ইংরাজ সৈন্য ভূটান আক্রমণ করে (১৮৬৫ খ্রীঃ)। ভূটানীদের সংগে যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনী পরাস্ত হয় এবং ভূটানীদের সংগে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ভূটানের রাজা উত্তর বাংলার ডুয়ার্স অঞ্চলটি ইংরাজদের সমর্পণ করেন এবং ইংরাজ সরকার ভূটানের রাজাকে বাৎসরিক কর দিতে রাজী হন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইংরাজ-শাসিত ভারতের সংগে আফগানিস্থানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সম্পর্ক মোটামুটি শান্তিপূর্ণই ছিল কিন্তু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থানে গৃহযুদ্ধের সূচনা হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আফগানিস্থানের গৃহ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে রাশিয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে—এই আশংকা করে ভারত সরকার আফগানিস্থানে

ইংরাজ বাহিনী পাঠান। ফলে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮৩৯ খ্রীঃ)। ইংরাজ বাহিনী কান্দাহার দখল করে, আফগানিস্থানের আমীর 'দোস্ত মহম্মদ' আত্মসমর্পণ করেন ও তাঁকে কলকাতায় নজরবন্দী করে রাখা হয়। ইংরাজদের আশ্রিত শাহ্ সুজাকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে আবার সিংহাসন দখল করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হলে শের আলি আমীর হন। এই সময় মধ্য-এশিয়ার রুশ শক্তির দ্রুত প্রসারে ভীত হয়ে ভারত সরকার কাবুলে এক ইংরাজ রাজদূত রাখার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শের আলি তাতে রাজী না হওয়ায় এক ইংরাজবাহিনী আফগানিস্থান আক্রমণ করে—যা দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ নামে খ্যাত (১৮৭৮-৮১ খ্রীঃ)। শের আলি পালিয়ে যান এবং তাঁর ছেলে ইয়াকুব খাঁ ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির শর্ত-অনুসারে ইয়াকুব খাঁকে আমীর বলে স্বীকার করা হয় এবং আফগানিস্তানের বিদেশ নীতি পরিচালনার ভার ইংরাজ সরকার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় আফগানরা এই অপমানজনক সন্ধি বাতিল করে ও কাবুলের ইংরাজ রেসিডেণ্টকে হত্যা করে। ফলে আবার সংঘর্ষ বাধে। আফগানরা পরাস্ত হয় ও ইংরাজরা আব্দুর রহমানকে আমীর পদে অধিষ্ঠিত করে। আফগানিস্থানে ভারত সরকারের প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার মার্টিমার ডুরাণ্ড কাবুলে এসে আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করেন। ইতিহাসে এই সীমারেখা 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আফগানিস্থানের পার্বত্য উপজাতিগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্তে প্রায়ই লুঠতরাজ চালাত।

আফগানিস্থান

ভারতের বড়লাট ও ঘোর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভারতের দুই সীমান্তে ইংরাজদের আধিপত্য সুদৃঢ় করতে যত্নবান হন। তিনি প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চিত্রাল নামে রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এর পর তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দেশ তিব্বতে ইংরাজদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে যত্নবান হন। তাঁর তিব্বত নীতির মূলে ছিল রুশ ভীতি। তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য লর্ড কার্জন ইয়ং হাসবেণ্ড নামে এক কর্মচারীকে তিব্বতে পাঠান। ইয়ং হাসবেণ্ড জোর

করে তিব্বতে প্রবেশ করে রাজধানী লাসা দখল করেন। দলাই লামা পালিয়ে গেলে তিব্বতীরা সন্ধি করতে বাধ্য হয় (১৯০৪ খ্রীঃ)। এর শর্ত অনুসারে তিব্বতে ইংরাজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হয় এবং তিব্বতের বিদেশ নীতি পরিচালনার ভার ভারতসরকার গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মদেশের সংগে ইংরাজদের এর আগেই দুটি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—(প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ)। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ বা শেষ যুদ্ধে ব্রহ্ম রাজ থিবো ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় ও ভারতের সংগে ব্রহ্মদেশকে সংযুক্ত করা হয়।

এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়

(৩) উনবিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হল হিন্দু সমাজের সংস্কার। ইংরাজ শাসনের প্রবর্তন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের কাজকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও জ্ঞানদীপ্ত নেতাদের উদ্যোগে সমাজের ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ব্রাহ্ম-সমাজ

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা থেকেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হয়। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ও মূর্তি পূজার বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে কুসংস্কার ও জড়ত্ব থেকে মুক্ত করতে হলে ধর্মের মত সমাজেরও সংস্কার প্রয়োজন। তিনি জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করে এক ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতারও প্রবল সমর্থক ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহ্য বহন করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। রামমোহনের আদর্শ অনুসরণ করে ব্রাহ্মরা জাতিভেদ, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের তীব্র নিন্দা করে এবং সেই সংগে বিধবা-বিবাহ ও নারী-

শিক্ষারও আন্দোলন করে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন ধারার **ওপর** ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের অনুকরণে মহারাষ্ট্র দেশেও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'প্রার্থনা সমাজ'-নামে এক সংস্থা এবিষয়ে অগ্রণী হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিচারপতি মাধব গোবিন্দ রাণাডে। সমাজ-উন্নয়ন ও নারী-কল্যাণ ব্যাপারে প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসরণ করত। অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সমাজের দুঃস্থদের উন্নয়ন ইত্যাদি প্রার্থনা সমাজের প্রধান কর্মসূচী ছিল।

প্রার্থনা সমাজ

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মত আর্য-সমাজ নামে আর এক সংস্থাও ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩ খ্রীঃ)। তিনি বেদের নির্দেশ ও আদর্শ অনুসারে ধর্মের ও সমাজের সংস্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহনের মত দয়ানন্দও বর্ণ-প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সমুদ্র-যাত্রা, বিধবা-বিবাহ ও নারী-শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। দয়ানন্দের মতবাদ পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আর্য-সমাজ

ঊনবিংশ শতকের আর এক উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হল রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) ছিলেন বাংলার দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরের এক সাধারণ পূজারী। সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম এবং তাঁর মতবাদের মূল কথাই ছিল "যত মত তত পথ"। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের বাণী স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করেন। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসেবা ও মানুষের নৈতিক উন্নয়ন করাই হল এই মিশনের প্রধান ব্রত।

রামকৃষ্ণ মিশন

ইসলাম সমাজের সংস্কার আন্দোলন প্রায় একই সংগে আরম্ভ হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার অনুকরণে ইসলাম ধর্মে ও সমাজে সংস্কার সাধনের প্রয়োজন মুসলমান সম্প্রদায় অনুভব করে। এই বিষয়ে প্রথমে অগ্রণী হন কলকাতার মুসলিম শিক্ষা-বিষয়ক

সমিতি' নামে এক সংস্থা। মুসলমান সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কারক ছিলেন আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রীঃ)। তিনি সারাজীবন ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান, অজ্ঞানতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যান। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের প্রগতিমূলক আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি মুসলমানগণকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের প্রগতিমূলক আদর্শ গ্রহণে উৎসাহ দেন। তিনি মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দা প্রথার নিন্দা করেন ও নারী শিক্ষার সমর্থন করেন।

ইসলাম সমাজে সংস্কার

(৪) ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবনীয় প্রসার ঘটে। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করে ইউরোপের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইউরোপের জাতীয়তাবাদের আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতবাসী জ্ঞানলাভ করে। বার্ক, বেন্থাম, মিল, ম্যাকলে প্রমুখ ইংরাজ মনীষীদের রচনা ভারতবাসীকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ইটালী, গ্রীস ও আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-আন্দোলন ইত্যাদিও ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ভারতে ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ইংরাজ সরকারের অর্থনীতি পরিচালিত হওয়ায় ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি সরকারের সব রকমের উঁচু ও দায়িত্বশীল পদ থেকেও শিক্ষিত ভারতবাসীকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে ক্ষোভ ও ঘৃণা ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং তারা বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্থা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে - যথা 'জমিদার-সমিতি', 'ব্রিটিশ-ভারত সমিতি', 'ভারত লীগ', 'ভারত-সভা' ইত্যাদি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-সভা'র প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতপক্ষে ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। অনেকে মনে করেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামে এক উদারপন্থী অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারীর পরিকল্পনা থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসই হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের

জাতীয় কংগ্রেস

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকমান্য তিলক

কাজকর্ম ও নীতির সমালোচনা করে কিছু কিছু রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া করে যেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস প্রথম দিকে ইংরাজ সরকারের বিরোধী ছিল না। সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে কিছু দাবি-দাওয়া আদায় করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সরকার কংগ্রেসকে তাচ্ছিল্য করে যেতে থাকলে কংগ্রেসের এক অন্যতম নেতা মহারাষ্ট্রের বালগংগাধর তিলক কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির প্রতিবাদ করে সরকার-বিরোধী কর্মসূচীর সুপারিশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে 'স্বরাজ' ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। তিলকের এই ঘোষণা কংগ্রেসের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং এক নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই গোষ্ঠী আবেদন-নিবেদন নীতি বর্জন করে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করার জন্য জোর প্রচার শুরু করে। এই গোষ্ঠী, কংগ্রেসের মধ্যে 'চরমপন্থী' নামে পরিচিত হয়। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠী যাদের হাতে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল তা 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত হয়। 'চরমপন্থীরা' সক্রিয় ও বিপ্লবমুখী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নরমপন্থীরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। চরমপন্থীরা ছিলেন পূর্ণ স্বরাজের উগ্র সমর্থক। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে বাংলায় 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ক্রমে এই আন্দোলন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা এই আন্দোলনের সামিল হন। ক্রমে বংগ-ভংগ-বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামশীল আন্দোলনে পরিণত হয়। চরমপন্থীরা 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হলে নরমপন্থীদের সংগে তাঁদের বিরোধ বাধে। ফলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন। চরমপন্থী নেতারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানান। তাঁরা সরকারের সংগে সব রকমের সহযোগিতা বর্জন করার জন্য ভারতবাসীকে পরামর্শ দেন। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদীরা ভারতবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে প্রয়াসী হন ও স্বাধীনতার আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলেন। এই আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরাজ সরকারও তৎপর হয়ে ওঠেন এবং জাতীয়তাবাদীদের উপর নানা অত্যাচার ও নিপীড়ন চলে। তিলককে গ্রেপ্তার করা হলে এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দিলে চরমপন্থীদের আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। চরমপন্থীরা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি লাভ করে তিলক 'হোম-রুল' আন্দোলনের সূচনা করেন।

অনুশীলনী

১। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের নতুন শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

২। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংগ-আফগান সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পরিচয় দাও।

৫। রাজা রামমোহন রায় কে ছিলেন? ভারতের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর অবদান কি?

৬। ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি কিভাবে হয়? এই সমাজের কর্মসূচী কি ছিল?

৭। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ কে ছিলেন? তাঁর আদর্শ কি ছিল?

৮। ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কি ভাবে ঘটে?

৯। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? প্রথম দিকে কংগ্রেসের লক্ষ্য কি ছিল?

১০। ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থীদের উদ্ভব কিভাবে হয়? চরমপন্থী নেতাদের কয়েকজনের নাম কর।

১১। চরমপন্থী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) | দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

কোন বিরাট যুদ্ধ বা বিপ্লব শুধু একটা কারণেই ঘটে না। এর মূলে থাকে নানা কারণের ঘাত-প্রতিঘাত।

জার্মানীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বিসমার্কের চেষ্টায় জার্মানী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তারপর আরম্ভ হয় জার্মানীর ইতিহাসে এক নতুন গৌরবময় অধ্যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সকে পরাস্ত করে জার্মানী ইউরোপের এক অন্যতম রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়।

(১) জার্মানীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা

জার্মানী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি, সুতরাং জার্মানীর কর্তব্য হল বিশ্বের সব জাতির ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করা—এই কাল্পনিক বিশ্বাস জার্মানদের মনে জাগে। জার্মানদের এই আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন কাইজার বা সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম। কাইজারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ইউরোপে এক দারুণ আশংকার সৃষ্টি করে।

কাইজার

জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পশ্চিম ইউরোপের শান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর কাছে পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স ভুলতে পারে নি। ফ্রান্স আলসাস ও লোরেণ হারায়। এই জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফ্রান্স উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে এই ধারণাই জন্মায় যে আলসাস ও লোরেণ পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত ফ্রান্স ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কিন্তু স্বেচ্ছায় ফ্রান্সকে তা ফিরিয়ে দিতে জার্মানী মোটেই রাজী ছিল না। সুতরাং জার্মানীর সংগে ফ্রান্সের যুদ্ধ ছিল অনিবার্য।

(২) ফ্রাঙ্কো-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উনবিংশ শতকের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে জার্মানী ইংল্যান্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এছাড়া জার্মানীর নৌ-শক্তিতে ভয় পেয়ে ইংল্যান্ড তার নৌ-শক্তি বাড়িয়ে চলে। ফলে জার্মানী ও ইংল্যান্ডের মধ্যে নৌ-প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়।

(৩) ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বলকান অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদও ইউরোপের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ইউরোপের বলকান নামে অঞ্চলটি এক সময় তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কী শব্দ 'বলকান' অর্থে পাহাড় এবং রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবে দানিয়ুব ও ঈজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বোঝায়। এই অঞ্চলে ছিল সার্ব, বুলগার, গ্রীক, আলবানিয়ান ইত্যাদি নানা জাতির মিলন ক্ষেত্র। তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর বলকান অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়া, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ব-ইউরোপকে অশান্ত করে তোলে। বড় বড় রাষ্ট্রের স্বার্থসংঘাত এই অঞ্চলে এক বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে ও তা বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগায়।

(৪) বলকান জাতীয়তাবাদ

ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপর কারণ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। জার্মানী ও ইটালীর জন্য সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং জার্মানী ও ইটালীর অতৃপ্ত ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে।

(৫) ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, সামরিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত ইউরোপকে দুটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত করে—একদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রীজোট এবং অপর দিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত জোট। দুই পক্ষই যুদ্ধের আশংকায় নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলে। ফলে যুদ্ধ হয়ে ওঠে অনিবার্য।

(৬) ইউরোপ দুটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ আর্চ ডিউক ফার্ডিনান্ড বোসনিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভো নগরে এক আততায়ীর হাতে পত্নীসহ নিহত হন। আততায়ী ছিল অস্ট্রিয়ার প্রজা এবং জাতিতে শ্লাভ। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত শ্লাভদের প্রশ্ন নিয়ে সার্বিয়ার সংগে অস্ট্রিয়ার বিরোধ আগে থেকেই ছিল। হত্যাকাণ্ডের অজুহাতে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে ও তার কাছে কয়েকটি অসম্ভব দাবি উত্থাপন করে। সার্বিয়া তাতে রাজী না হওয়ায় অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর রাজ্যলিপ্সায় বাধা দেওয়ার জন্য সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়।

বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধ শুরু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তুরস্ক, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। ইটালী, জাপান, রাশিয়া ও পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে (যা 'মিত্রপক্ষ' নামে পরিচিত) যোগ দেয়। ফলে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা

বিশ্বের ইতিহাসে এই ধরনের যুদ্ধ আগে কখনও হয়নি। প্রথমতঃ, কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশ ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব দেশই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ধ্বংসের ভয়াল রূপ এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এর কারণ ছিল নানা ধরনের মারণাস্ত্রের ব্যবহার, যেমন— আকাশ যুদ্ধে বোমারু বিমান, জল যুদ্ধে সাবমেরিণ বা ডুবো-জাহাজ ও স্থল-যুদ্ধে ভারী কামান, ট্যাংক, বিস্ফোরক বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি। এই সব যুদ্ধাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক রূপ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং সামরিক ও বে-সামরিক সকলকেই সমান ভাবে বিপদে পড়তে হয়। তৃতীয়তঃ, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের সংগে সংগে মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তিও বেড়ে যায়। বহু অঞ্চলের অসামরিক জনসাধারণকে হত্যা করা হয় এবং গ্রামের পর গ্রাম ও শহরের পর শহর ধ্বংস হয়ে যায়। এমন কি গির্জা ও শিক্ষায়তনগুলোও এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

চার বছর যুদ্ধ চলার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর পরাজিত জার্মানী যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে জার্মানীর সংগে মিত্রপক্ষের **ভার্সাই-সন্ধি** স্বাক্ষরিত হয় ও অন্যান্য পরাস্ত দেশের সংগেও সন্ধি হয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি ও ভার্সাই সন্ধি

ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে চারটি বড় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে—যেমন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জার্মানী। রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের ফলে অনেক অনেক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়; যথা—চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নতুন পোল্যান্ড ইত্যাদি। ফলে ইউরোপের মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

এই যুদ্ধের অন্যতম ফল হল জাতীয়তাবাদের সাফল্য। বল্কান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদের আংশিক সাফল্য হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় এই সাফল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই যুদ্ধের ফলে গণতন্ত্রবাদেরও প্রসার ঘটে। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সম্মত সংবিধানের প্রবর্তন করা হয়। পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও ভোটের অধিকার স্বীকার করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিকদের অবদান ছিল সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং যুদ্ধের পর শ্রমিকশ্রেণী স্বভাবতই নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। শ্রমজীবিদের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করা হয়।

এই যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার ঘটে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপায় হিসাবে 'লীগ-অফ-নেসনস্' নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ছিল ব্রিটেনের শক্তির প্রধান উৎস। যুদ্ধের পর রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সহজ হবে—এই আশায় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটেনকে সব রকমভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এমন কি চরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলক ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনে ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট সব ভারতবাসীর কর্তব্য হল ব্রিটিশ সরকারকে দরাজ হাতে সাহায্য করা। ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে সাহায্য করার প্রতিদান হিসাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে

যুদ্ধে ভারতের অবদান ঃ কারণ

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মঞ্জুর করবেন। এই বিশ্বাসেই ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে অর্থ, রসদ ও যুদ্ধের নানা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেনি। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্যের ঢেউ বয়ে যায়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অনুকূলে ভারতের অবদান এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাদের কৃতিত্ব ব্রিটিশ জনগণ ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের চমৎকৃত করে।

ভারতবাসীর হতাশা ও অসন্তোষ

ভারতবাসী যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সাহায্য করেছিল, যুদ্ধের শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ভারতবাসীকে হতাশ করল। এখানে মনে রাখা দরকার যে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষ বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলোকে গণতন্ত্র ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সহযোগিতা লাভ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা সেই প্রতিশ্রুতি পালনে মোটেই উৎসাহী হন না। ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন জাতিগুলোর মত ভারতবাসীর মনেও হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক সংকট

অন্য দিকে যুদ্ধের ফলে ভারতে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে যায়। যুদ্ধের পর দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা। যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পগুলি খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কারণ বিদেশী জিনিসপত্রের আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বিদেশী জিনিসপত্রের আমদানী আবার শুরু হয় ও ভারতীয় শিল্পজাত জিনিসপত্রের ওপর কড়া হারে শুল্ক ধার্য হয়। ফলে ভারতের শিল্প সংস্থাগুলির বেশীরভাগই লোকসান সামলাতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক ও মজুর বেকার হয়ে পড়ে। কৃষি জমির ওপর খাজনার হার বেড়ে যাওয়ায় কৃষকদের দারিদ্র্য চরমে ওঠে। যুদ্ধ শেষ হলে ভারতীয় সেনা ও সামরিক কর্মচারীদের বেশীর ভাগই ছাঁটাই হয়ে বেকারে পরিণত হয়। সুতরাং ভারতের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষের আর্থিক দুরাবস্থা চরমে ওঠে।

এই অবস্থায় ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে জনগণের সুগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের কাছ

থেকে কোন সুবিচার পাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থীদের প্রতিপত্তি থাকায় তাঁদের পক্ষে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব ছিল না। **অ্যানি বেসান্ত** নামে এক সহৃদয়া ইংরাজ মহিলা ও জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যা গণ-আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি আয়ারল্যাণ্ডের 'হোমরুললীগের' অনুকরণে ভারতে **'হোমরুল'** বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। জনগণের নির্বাচিত এক দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই অ্যানি বেসান্তের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের মনঃপূত হল না। ফলে বেসান্ত নিজের দায়িত্বেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'হোমরুল-লীগ' নামে এক রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাই, কানপুর, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজে এই সংস্থার শাখা স্থাপন করা হয়। বেসান্ত 'নিউ ইণ্ডিয়া' (নতুন ভারত) নামে এক দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। ভারতের প্রতি বেসান্তের অনুরাগ ও তাঁর সংগঠনী প্রতিভা ভারতবাসীকে মুগ্ধ করে। বেসান্তের অনুকরণে তিলকও মহারাষ্ট্রে পৃথক এক হোমরুললীগের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা-সমিতি করে বেড়ান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি প্রচার করেন। গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভাষায় বক্তৃতা করে তিলক এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিলক জননেতার মর্যাদা লাভ করেন এবং ভারতবাসীর কাছে তিনি 'লোকমান্য' নামে পরিচিত হন। বেসান্তের 'হোমরুল' আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশের মানুষ তীব্র ভাষায় এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাল। কিছুদিনের মধ্যেই তিলককেও গ্রেপ্তার করা হল ও তাঁকে কয়েক হাজার টাকা জরিমানা করা হল। তিলক এই জরিমানা দিতে অসম্মত হলে, ভারতবাসী তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

'হোমরুল' আন্দোলন

অ্যানি বেসান্ত

এদিকে হোমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে জাতীয় কংগ্রেসের অনেকেই ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী—নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আবার মিলন ঘটে। তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা আবার কংগ্রেসে সসম্মানে ফিরে আসেন। এই দুই গোষ্ঠীর মিলন কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতে কংগ্রেস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

১৯১৬ সালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কংগ্রেস ও মুসলিম-লীগের মধ্যে চুক্তি যা লক্ষ্ণৌচুক্তি নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও হোমরুল আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের যেমন রূপান্তর ঘটছিল, তেমনি মুসলিম লীগের মধ্যেও তা ঘটছিল। শিক্ষিত মুসলিম যুব সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য ক্রমেই উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। সে সময় কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা যেমন মৌলানা আজাদ, আনসারী, আজমল খাঁ প্রভৃতিকে নজরবন্দী করে রাখা হলে মুসলিমলীগের নেতারা কংগ্রেসের সংগে হাতে-হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হতে রাজী হন। এই ব্যাপারে অগ্রণী হন মহম্মদ আলি জিন্না ও তিলক। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি হয়। কংগ্রেস মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবি মেনে নেয় এবং মুসলিম-লীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ-আদর্শ' মেনে নেয়। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ এক সংগে আন্দোলন চালিয়ে যেতে রাজী হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যায়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

মহম্মদ আলি জিন্না

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগে সংগে ভারতে ও ভারতের বাইরে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বংগ-ভংগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী

আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সে সময় বহু গোপন বিপ্লবী সংঘ গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। বিপ্লবী আন্দোলনের মূলে ছিল কংগ্রেসী আন্দোলনের আশানুরূপ সাফল্যের অভাব, জাতীয়তাবাদীদের ওপর ব্রিটিশদের নির্যাতন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রভাব। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের মধ্যে গোপন যোগাযোগ ছিল। প্রথমদিকের বিপ্লবীদের মধ্যে বাসুদেব বলবন্দ ফাদকে, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সতীশচন্দ্র বসু, ক্ষুদীরাম বসু, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতির নাম করা যায়। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নানাভাবে ব্রিটিশ সরকার ও রাজকর্মচারীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই এঁদের লক্ষ্য ছিল। বাংলার 'অনুশীলন সমিতি' (প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু) নামে গোপন সমিতিটি ছিল এই ব্যাপারে অগ্রণী। বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই সমিতির শাখা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির কিছু বিপ্লবী কলকাতা বন্দর থেকে—বিদেশ থেকে আমদানী করা বাক্সভর্তি কার্তুজ ও পিস্তল সংগ্রহ করে ও তা বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবীদের গুলিতে বহু প্রতিক্রিয়াশীল রাজ-কর্মচারী নিহত হন। এর ফলে ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সেই বছরেই 'বাঘা যতীন' নামে সুপরিচিত যতীন মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে (উড়িষ্যা) ইংরাজদের সংগে কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে নিহত হন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'বাঘা যতীনের' আত্মত্যাগ আজও অবিস্মরণীয়। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে দুই বিদেশী—মার্গারেট নোবেল বা ভগিনী নিবেদিতা ও জনৈক জাপানী ওকাকুরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

বিপ্লবী আন্দোলন

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মানীর দলে যোগ দিলে পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের তৎপরতা বেড়ে যায়। সেই সংগে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। তাদের নেতা ছিলেন মৌলভি ওবেদুল্লাহ্। তাঁর দলের লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করা।

বিপ্লবী আন্দোলন ভারতের বাইরেও চলে। আমেরিকায় 'গদর দল' নামে এক বিপ্লবী সংস্থা এর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল—(১৯১৩ খ্রীঃ)। 'গদর' শব্দের অর্থ হল বিপ্লব। এই দলের সভ্যদের বেশীর ভাগই ছিল

শিখ কৃষক ও সৈনিক। মেক্সিকো, কানাডা, জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে এই দলের শাখা ছিল। ব্রিটিশদের শাসন থেকে যে কোন উপায়ে স্বদেশকে মুক্ত করাই এই দলের লক্ষ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেই, গদর দল সেই সুযোগে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত বহু বিপ্লবীকে বিভিন্ন দলে ভারতে পাঠায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা ও ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতার ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিপ্লবীদের নানা কঠিন দণ্ড দেওয়া হয়। ভারতের বাইরে যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, আব্দুল রহিম, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নাম সকলের আগে করা যায়।

রাসবিহারী বসু

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময় ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উদয় হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। কিছুদিনের মধ্যেই এক মামলা উপলক্ষ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। সে সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের হাতে প্রবাসী ভারতীয়দের নানা লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হত। গান্ধীজী তা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং এর প্রতিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এই আন্দোলনের নাম দেন 'অহিংস-সত্যাগ্রহ'। কোন রকম শক্তি প্রয়োগ না করে ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তিনি আখ্যা দেন সত্যাগ্রহ বা 'অহিংস অসহযোগ'। তাঁর সংগ্রামের এই আদর্শ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজীর সাফল্যের খবর ভারতে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং ভারতবাসী এক নতুন পথের সন্ধান পায়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী স্বদেশে ফিরে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

করেন। সে সময় বিহারের চম্পারণে নীল চাষীদের ওপর ইংরাজ নীলকরদের অত্যাচার আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘট ও গুজরাটে কৃষক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। গুজরাটে কৃষক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বল্লভভাই প্যাটেল 'সর্দার' নামে খ্যাতি লাভ করেন। গান্ধীজী এই সব আন্দোলনে অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি প্রয়োগ করে বিরাট সাফল্য লাভ করেন এবং ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় বিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে **'রাওলাট আইন'** নামে এক কুখ্যাত আইন জারী করেন (১৯১৯ খ্রীঃ)। এই আইনের দ্বারা ভারতীয় সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ধর্মঘট পালন করা হয়। দেশের নানা জায়গায় ধর্মঘটীদের সংগে সরকারের সংঘর্ষ বাধে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই খবর দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করে। গান্ধীজী সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

রাওলাট আইন

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের সূচনা হয় তার চরম পরিণতি ঘটে **"জালিয়ান-ওয়ালাবাগের" হত্যাকাণ্ডে** (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ খ্রীঃ)। পাঞ্জাবে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে সেখানকার দুই জনপ্রিয় নেতা ডক্টর সত্যপাল ও ডক্টর কিচলিউকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে অমৃতসরের নাগরিকরা জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে এক ময়দানে জড় হন। জনতা ছিল নিরস্ত্র ও শান্ত। জেনারেল-ও-ডায়ার নামে এক সামরিক কর্মচারী আগে থেকে কোন রকম সতর্ক না করেই জনতার ওপর গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। ফলে বহু মানুষ প্রাণ হারান। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক গভীর ঘৃণার সঞ্চার হয়।

জালিয়ান-ওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে মুসলমানদের মধ্যেও দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধে, জার্মানীর পক্ষে যাওয়ার অপরাধে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করা হয়। তুর্কীসুলতানের প্রতি এই অবিচারে ভারতের মুসলিম সমাজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিকারের জন্য বোম্বাই শহরে খিলাফত কমিটি গঠন করা হয় (১১ই নভেম্বর ১৯১৯ খ্রীঃ) এবং 'খিলাফত' আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি।

মুসলিম অসন্তোষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ এই সব কারণে ব্রিটিশ সরকার অস্বস্তিবোধ করেন। ভারতবাসীকে কিছুটা সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বা 'মণ্ট-ফোর্ড' আইন পাশ করা হয়। এই আইনে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সম্প্রসারণ ও নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বাড়াবার এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদে কিছু ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব এই আইনে না থাকায় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে।

মণ্টফোর্ড প্রস্তাব

অনুশীলনী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয় কেন? কোন্ কোন্ দেশ এই যুদ্ধে যোগ দেয়?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতার কারণ কি? এই যুদ্ধে কি কি নূতন মারণাস্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছিল? ভারতবাসী এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে কেন সাহায্য করেছিল?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। ভারতে বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৫। রাওলাট আইন কবে এবং কেন পাস করা হয়েছিল?

৬। গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' আদর্শ বলতে কি বোঝায়?

৭। জালিয়াঁনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কি জান?

৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ কি? খিলাফত, আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা কে ছিলেন?

রুশ বিপ্লব | ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ-বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লবকে একাধারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব বলা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পর এই ধরনের এক ব্যাপক বিপ্লব আর কোথাও ঘটে নি।

ভূমিকা

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া

রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভূ ছিলেন "জার" বা সম্রাট। তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধীশ্বর। অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রই ছিল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। জার ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব করতেন। দেশে কোন নির্দিষ্ট আইন-কানুন ছিল না। জারের আদেশ ও ঘোষণাপত্রই ছিল আইন। প্রায় তিনশ বছর ধরে রাশিয়ায় স্বৈরাচারী জারতন্ত্র কায়েম ছিল যদিও এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমলাতন্ত্রই ছিল শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিজাতদের মধ্যে থেকেই সব রকমের দায়িত্বশীল কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। সাধারণ শ্রেণীর মানুষেরা এই সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। শাসনযন্ত্রের অপর অন্যতম অংগ ছিল পুলিশবাহিনী। পুলিশ বিভাগের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। যে কোনও লোককে যে কোনও সময় বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল এই বিভাগের। জনসাধারণের ওপর পুলিশের অত্যাচার ছিল সর্বজনবিদিত। প্রকৃত পক্ষে জারের স্বৈরতন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গুপ্তচর বাহিনী।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ছিল অত্যন্ত বেশী। এক দিকে ছিল ধনী ও অত্যাচারী অভিজাত বা জমিদার শ্রেণী ও অন্যদিকে দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অসহায় কৃষক বা অর্ধদাস শ্রেণী। রুশ সাম্রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জমিদার বা অভিজাত পরিবার ছিল। জমিদারদের ঐশ্বর্যের পরিমাণ নির্ণয় হত তাদের অধীনে অর্ধদাসদের সংখ্যা দিয়ে। অর্থাৎ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

যার যত বেশী অর্ধদাস থাকত তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা তত বেশী বলে গণ্য হত। ফরাসী বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের অভিজাতরা যে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, রাশিয়ার অভিজাতরাও তাই ভোগ করতেন। ফ্রান্সের অভিজাতদের মত রাশিয়ার অভিজাতরাও সব রকমের কর্তব্য পালন করা থেকে মুক্ত থাকতেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাশিয়া ছিল কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষির প্রধান অংগ ছিল সার্ফ বা অর্ধদাস। জমির সংগে অর্ধদাসদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এদের ব্যক্তিগত সব কিছুই মালিকদের সম্পত্তি বলে মনে করা হত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ) 'মুক্তি-নির্দেশ'-নামে এক আইন জারী করে সার্ফদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের নাগরিক অধিকার দেন (১৮৬১ খ্রীঃ)। মুক্তদাসেরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেনার অধিকার পায়। কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয় বটে কিন্তু তবুও তাদের অভাব-অভিযোগ থেকে যায়। কৃষকদের ব্যক্তিগতভাবে জমি না দিয়ে তা সমষ্টিগতভাবে 'মীর' নামে এক সমবায় সংস্থার অধীনে রাখা হয়। কিন্তু 'মীর'-এর আধিপত্য কৃষকদের অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়ায় পশ্চিম ইউরোপের অনুকরণে কিছু কিছু শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠে। ধনী পুঁজিপতিরাই ছিল কল-কারখানার মালিক। রাশিয়াতেও শিল্প-বিপ্লবের কুফল দেখা দেয় শ্রমিকদের উপর মালিকদের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়ে! এই সময়, শিল্পোন্নতির সংগে সংগে রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই জারতন্ত্র ও অভিজাতদের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠে। শ্রমিকরা কলকারখানায় ইউনিয়ন গঠন করে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হতে পারে—এই আশংকায় জার সরকার শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট ও শ্রমিকসংঘ গঠন করা নিষিদ্ধ করেন। একদিকে কৃষকদের ওপর 'মীর'-দের অত্যাচার ও অন্যদিকে শ্রমিকদের ওপর মালিকদের অত্যাচার সমানে চলতে থাকে এবং এর ফলে এক নতুন বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা

বিংশ শতকের প্রথম দিকে কৃষকশ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জারের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। টলস্টয় প্রভৃতি রাশিয়ার কয়েকজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে রুশ জনসাধারণের দুরবস্থা ও অত্যাচারী জার-শাসনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবী প্রচার-পত্র প্রকাশ হতে থাকে। সেই সঙ্গে অনেকগুলো বিপ্লবী সংস্থাও গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কয়েকটি উদারপন্থী রাজনৈতিক দলেরও উদ্ভব হয়। উদারপন্থীরা ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে কার্ল মার্কস্-এর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সমাজতন্ত্রীরা জার সরকারের উচ্ছেদের জন্য জোর প্রচার শুরু করে। সমাজতন্ত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলশেভিক ও সংখ্যালঘু দল মেনশেভিক নামে পরিচিত ছিল। বলশেভিক দলের নেতা ছিলেন লেনিন। তিনি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের উগ্র সমর্থক ছিলেন। বিংশ শতকের শুরু থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। সে সময় জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন দুর্বল ও ভীরু। দুর্বল রাজার অধীনে সরকার অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। বুদ্ধিজীবী মাত্রই বিপ্লবী, এই বিশ্বাসে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়। ঠিক এই সময় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের কাছে রাশিয়া পরাস্ত হলে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে জার-সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেই বছর (১৯০৫ খ্রীঃ) এক দল ধর্মঘটী শ্রমিক তাদের দাবি জানাবার জন্য জারের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে জারের সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে বহু শ্রমিককে হতাহত করে।

লেনিন

এই হত্যাকাণ্ড 'রক্তাক্ত-রবিবার'-নামে খ্যাত। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে নানা জায়গায় রুশ-জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এই ধরনের ব্যাপক ধর্মঘট আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে কখনও ঘটে নি। এই অবস্থায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস ভয় পেয়ে 'ডুমা'-নামে এক গণ-পরিষদের অধিবেশন ডাকতে রাজী হন এবং শাসনব্যবস্থায় কিছু সংস্কার প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সংগে বিদ্রোহ থেমে যায়। কিন্তু সেই সুযোগে আবার আগের মত সরকারী নির্যাতন শুরু হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার একের পর এক ব্যর্থতা নতুন করে বিপ্লবে ইন্ধন জোগায়। জার্মানীর কাছে রাশিয়ার পরাজয় ঘটায় রুশ সমর নায়কদের অযোগ্যতা ও সরকারের অকর্মণ্যতা রুশদের নিকট ধরা পড়ে। সর্বত্র গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। কৃষকরা বিদ্রোহী হয়, শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং রুশ-সৈন্যরা দলে দলে যুদ্ধ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে আসে। এর ওপর খাদ্যের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট করে। সেনাবাহিনী ধর্মঘটীদের সংগে যোগ দেয়। বিপ্লব ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ও স্থানীয় শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রমিক ও সেনারা এক হয়ে রাজধানীতে ও অন্যান্য শহরে এক একটি 'সোভিয়েট' বা সমিতি গঠন করে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস অনন্যোপায় হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইভাবে রাশিয়ার শেষ রাজবংশের (রোমানভ) অবসান ঘটে (মার্চ ১৯১৭ খ্রীঃ)।

পেট্রোগ্রাডের বিদ্রোহ

মার্চ-বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এক সাধারণতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। এই সরকার সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু সে সময় রুশ-জনসাধারণের চাহিদা ছিল শান্তি, আহার ও বাসস্থান। তারা জমিদার ও শিল্পপতিদের উচ্ছেদ করে সমস্ত জমি ও কলকারখানা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু নরমপন্থী

সাধারণতন্ত্রী সরকার এই বিপ্লবী নীতির বিরোধী ছিলেন। এই অবস্থায় শ্রমিক ও সৈনিকরা বিভিন্ন শহরে সোভিয়েট গঠন করে জোর প্রচার চালাতে থাকে। ফলে অস্থায়ী সরকারের পতন ঘটে এবং মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি শাসন ক্ষমতা দখল করেন। কেরেনস্কির উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা ও জার্মানীর সংগে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কেরেনস্কির এই নীতি বলশেভিক দলের দুই নেতা লেনিন ও ট্রটস্কির মনঃপূত হল না। বলশেভিকরা ছিল উগ্রপন্থী। তারা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র স্থাপনের উগ্র সমর্থক ছিল। লেনিন জমি ও ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি রুশ-জনগণকে শান্তি, ঘরবাড়ী ও আহার্যের প্রতিশ্রুতি দেন। দেশের অশান্তময় পরিস্থিতির সুযোগে লেনিন ও তাঁর দুই সহকর্মী ট্রটস্কি ও স্ট্যালিন শাসন ক্ষমতা দখল করেন (৭ই নভেম্বর ১৯১৭ খ্রীঃ)। এই দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় বলশেভিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও রাশিয়ায় ৭ই নভেম্বর 'বিপ্লব দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। বলশেভিকরাই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট নামে পরিচিত হন।

অস্থায়ী সরকার
রুশ বিপ্লবের
দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ট্যালিন

ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বা বলশেভিক বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। গতি, প্রকৃতি ও প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে এই বিপ্লবকে এক মহাবিপ্লব বলা যায়। শুধুমাত্র রাশিয়ার ভেতরেই নয়, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ইউরোপের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার ওপর এই বিপ্লব প্রচণ্ড আঘাত হানে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে

নৌ-বিদ্রোহ ঘটে, জার্মান সম্রাট দেশত্যাগী হন ও রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। সেই সঙ্গে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'কমিণ্টার্ণ' নামে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপের অনেক দেশে সাম্যবাদী আদর্শ বিস্তার লাভ করে। এক সময় জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদ কিছুটা সাফল্য লাভ করে, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কোথাও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে নি। রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের সাফল্য ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী করে তুলতে পারে, এই আশঙ্কায় তারা রাশিয়ার সাম্যবাদ ধ্বংস করার চেষ্টা করে, যদিও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে জার্মানী ও ইটালীতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল সাম্যবাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

রুশ বিপ্লব ঔপনিবেশিক জগতেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশ্বের নানা দেশে বিদেশী শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ জনগণকে রুশ বিপ্লব মুক্তির সন্ধান দেয়। ভারতের ও চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। বিশ্বের নানা দেশে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নমূলক আন্দোলনেরও সূচনা হয়।

অনুশীলনী

১। রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা কর।
২। রুশ বিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?
৪। লেনিনের দুই সুযোগ্য সহকর্মীর নাম কি? কবে লেনিন রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করেন? এই দিনটি কি নামে পরিচিত?

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে সকলের আশা ছিল যে ইউরোপকে এমন ভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ না বাধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের প্রায় সব দেশই কোন-না-কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সমস্যাও ছিল খুবই জটিল। বিধ্বস্ত-বিশ্বের পুনর্গঠন করা, পরাজিত দেশগুলোকে শক্তিহীন করা, নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন হয়।

সম্মেলনের প্রধান নেতৃবৃন্দ

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের পরিচালনার ভার কেবলমাত্র চারটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, যথা—ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনশো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো। এঁরা 'প্রধান চারজন' (Big four) নামে খ্যাত ছিলেন। ক্লিমেনশো সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

উড্রো উইলসন

পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদ

শান্তির আদর্শ নিয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ এক এক দেশের এক এক রকমের স্বার্থ ছিল। এ ছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন অনেক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে কতকগুলো গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এই সব গোপন চুক্তি থাকার ফলে এক সর্ববাদীসম্মত শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করার পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। একমাত্র উড্রো উইলসন-ই রাষ্ট্র-গত স্বার্থ ত্যাগ করে ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সমর্থক

ছিলেন। তিনি সম্মেলনে জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন ও স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার জন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের কথা প্রচার করেন—যা তাঁর 'চোদ্দ-দফা নীতি' নামে খ্যাত। কিন্তু উড্রো
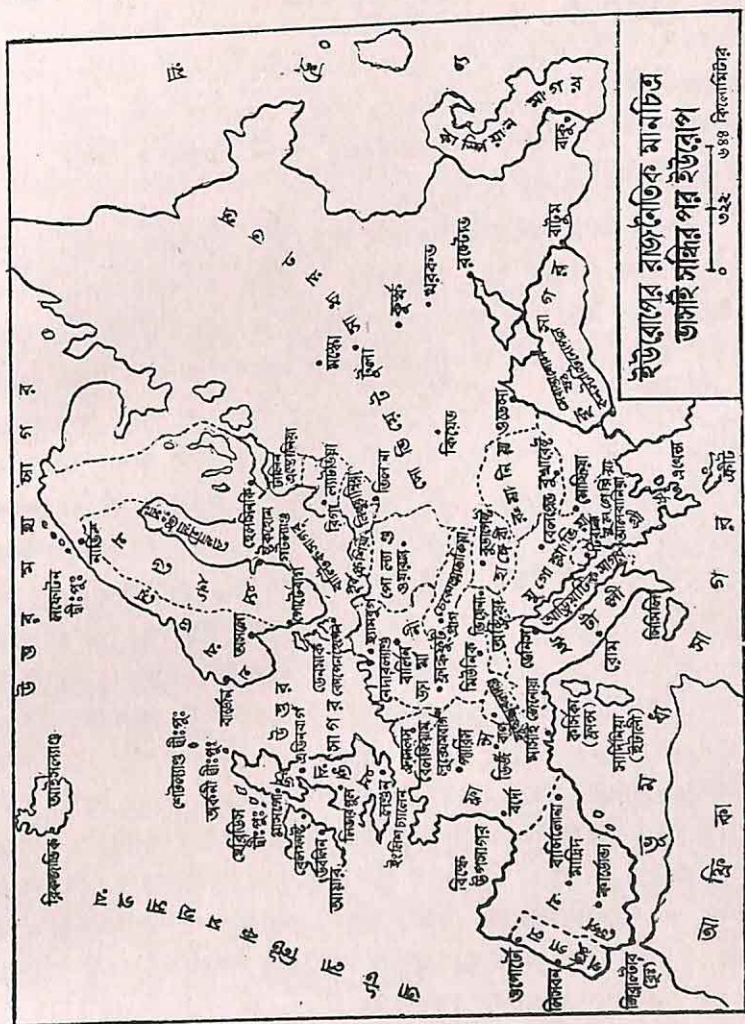
উইলসনের 'চোদ্দ-দফা নীতি' ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইটালী সরাসরি অগ্রাহ্য না করলেও তাদের পক্ষে তা পুরোপুরি গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। ফলে শান্তি-সম্মেলনে উড্রো-উইলসন ও অন্যান্য রাজনীতিকদের মধ্যে মতান্তর থেকে যায়, যেমন—একদিকে ন্যায়, সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি

প্রভৃতি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে জার্মানীকে সব দিক থেকে দুর্বল করে রেখে ইউরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা।

কয়েকটি সন্ধি পত্র রচনা করে ইউরোপের পুনর্গঠন করা হয়, যথা --

ইউরোপের পুনর্গঠন

জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই-এর সন্ধি ; অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মাইন-এর সন্ধি ; হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়ানন-এর সন্ধি ; বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলি-র সন্ধি এবং তুরস্কের সঙ্গে সেভরে-এর সন্ধি।

ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্মানীর কাছ থেকে আলসাস-লোরেন নিয়ে তা ফ্রান্সকে দেওয়া হয় ; জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত প্রাশিয়ার কিছু অংশ বেলজিয়ামকে এবং নতুন দুই রাষ্ট্র পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়াকে দেওয়া হয়। ইউরোপে জার্মানীর আয়তন যতদূর সম্ভব ছোট করে দেওয়া হয়।

সেণ্টজার্মেইন ও ট্রিয়ানন-সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হয়। ভিয়েনা ও তার সংলগ্ন এলাকার মধ্যেই অস্ট্রিয়ার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। লীগ-অফ-নেশনস বা জাতি-সংঘের অনুমতি ছাড়া জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি নিষিদ্ধ করা হয় ; নতুন রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়া অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে বোসনিয়া, হারজেগোভিনা ও ডালমাশিয়ার উপকূল অঞ্চল লাভ করে। সেইভাবে নতুন পোল্যান্ডকে ও রুমানিয়াকে যথাক্রমে দেওয়া হয় গ্যালিশিয়া ও বুকোভিনা। অস্ট্রিয়ার দুটি প্রদেশ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়াকে সংযুক্ত করে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে এক নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রিয়ানন-সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য থেকে হাঙ্গেরীকে বিচ্ছিন্ন করে এক নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। নিউলি-র সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়ার কিছু অংশ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। তুরস্কের সঙ্গে সেভরে-র সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া-মাইনর, থ্রেস ও গ্যালিপলি গ্রীসকে দেওয়া হয়।

এইভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন করা হয়। প্রত্যেক জাতির নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে—'এক জাতি, এক রাষ্ট্র'-এই নীতির ভিত্তিতেই ইউরোপের পুনর্গঠন করা হয় এবং ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হয়।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী ও পরাজিত শক্তিগুলোর মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ইউরোপে যথার্থ শান্তি আসে নি। বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির ফলে প্রায় সব দেশেই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। অগনিত লোকক্ষয়, অর্থনাশ, শিল্পের ধ্বংস; ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর ফলে ইউরোপের নানা দেশে বিশেষ করে ইটালী ও জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আবির্ভাব হয়।

ইটালীতেই প্রথমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আবির্ভাব হয়। বিশ্বযুদ্ধে ইটালী মিত্রপক্ষেই ছিল। কিন্তু প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আশানুরূপ পুরস্কার না পাওয়ায় ইটালীতে এক গভীর নৈরাশ্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীতে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। দেশের সব জায়গায় ধর্মঘট ও অরাজকতা ভীষণ ভাবে দেখা দেয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংসের ফলে বেকার সমস্যারও উদ্ভব হয়।

ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র

রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রশাসনে দুর্নীতি দেশময় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। দেশের এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে **বেনিটো মুসোলিনি** নামে এক নেতা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের নিয়ে এক শক্তিশালী দল গঠন করেন। এদের বলা হত 'ফ্যাসিস্ট'। দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে—এই ভেবে দলে দলে মানুষ মুসোলিনির দলে যোগ দেয়। ফ্যাসিবাদীরা ছিল সাম্যবাদের ঘোর বিরোধী ও ইটালীর জাতীয়তাবাদের উগ্র সমর্থক। ফ্যাসিবাদীরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের পররাষ্ট্র নীতির মূলে ছিল জঙ্গীবাদ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্টবাহিনী রোমের দিকে যাত্রা করে। ইটালীর রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল ভয় পেয়ে মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। মুসোলিনি ইটালীর সব বিরুদ্ধ দলগুলোকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে মুসোলিনি ইটালীর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

ক্রমে ইটালীতে সব রকমের আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়; ফ্যাসিবাদী

সংবাদপত্র ছাড়া আর সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয় এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ফ্যাসিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে মুসোলিনি নানা সংস্কার সাধনও করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যয় কমান হয়, অনেক অপ্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগ তুলে দেওয়া হয় ; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন করে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বাড়ান হয় ; ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে বেকার সমস্যার সমাধান করা হয়।

কিন্তু মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদী সরকারের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী ছিল। এই উদ্দেশ্যে মুসোলিনি পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। ইউরোপের বড় শক্তিগুলোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতি-সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। দু বছর পর ইটালী আলবানিয়া আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। একের পর এক দেশ জয় করে মুসোলিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দেন।

ইটালীর ফ্যাসিবাদী দলের মত ও প্রায় একই কারণে জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল নাৎসীদলের উদ্ভব হয়। ইটালীর মত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানীতেও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ও বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া "ভার্সাই সন্ধির" অপমানজনক শর্তগুলো জার্মানদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা ও প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র

জার্মানীর সামনে যখন অসংখ্য সমস্যা, জনসাধারণের দুর্দশা যখন চরমে, সেই সময় দেশের দুঃখদুর্দশার অবসানের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে **অ্যাডলফ্ হিটলার** ও তাঁর জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী দল (National Socialist Party) জার্মানীর রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হন। অ্যাডলফ্ হিটলার সৈনিক হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। 'মেইনক্যাম্ফ' ('আমার সংগ্রাম') নামে তাঁর রচিত আত্মজীবনীতে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ও নাৎসীদলের কর্মসূচীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নাৎসীদলের মূল নীতি ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, জার্মানী থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন এবং গণতন্ত্রের

ধ্বংসসাধন। হিটলার প্রাচীন আর্যদের 'স্বস্তিকা' চিহ্ন তাঁর দলের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন। নাৎসীদলের প্রধান কর্মসূচী ছিল সমস্ত জার্মান ভাষাভাষী জনগণকে নিয়ে এক শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা ও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন করা। হিটলারের নাৎসীবাদে আকৃষ্ট হয়ে যুব-শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী ও জার্মান ব্যবসায়ীরা তাঁর দলে যোগ দেয়। ফলে হিটলার ও তাঁর নাৎসীদল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসীদল 'রাইসস্ট্যাগে' বা পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং হিটলার চ্যান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মান-সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি হন ও সেই সংগে চ্যান্সেলারও থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের দমন করে হিটলার ও নাৎসীদল রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা দখল করেন। হিটলার 'ফুহেরার' (নেতা) নামে পরিচিত হন। এইভাবে জার্মানীতে হিটলার ও নাৎসীদলের একনায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

অ্যাডালফ্ হিটলার

পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে হিটলার অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দেন, প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বাতিল করেন; অ-জার্মান বলে ইহুদীদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। সেই সংগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও হিটলার সচেষ্ট হন। সরকারী পরিচালনায় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। জাতির সব রকমের সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

প্রথম থেকেই হিটলার ভার্সাই সন্ধির গ্লানি মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাছাড়া ইউরোপের সব জার্মান ভাষাভাষী জনগণকে নিয়ে এক বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য গড়ে তোলাও তাঁর বাসনা ছিল। এই কারণে তিনি সামরিক ও নৌবল গঠন করে জার্মানীকে আবার পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন উগ্র জংগীবাদী এবং তাঁর জংগীবাদী নীতির মূল কথাই ছিল বিদ্রোহ, হত্যা ও পররাজ্য গ্রাস। তিনি ইটালী ও

জাপানের সংগে এক ত্রি-মৈত্রী শক্তি জোট (অক্ষ শক্তি) গঠন করেন। ফলে বিশ্বে আবার এক যুদ্ধের আভাস ঘনিয়ে আসে।

সামরিক শক্তির গর্বে অন্ধ হয়ে হিটলার দাবি করেন যে জার্মানীর বাইরে যে সব অঞ্চলে জার্মানরা বসবাস করে সেগুলো জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হবে। এই অজুহাতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করেন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার এক অংশও দখল করেন। কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। এর পরে তাঁর দৃষ্টি পড়ল পোল্যাণ্ডের ওপর। হিটলারের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে রাশিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সংগে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাতে রাজী হল না। হিটলার সুযোগ বুঝে রাশিয়ার সংগে এক সন্ধি করেন (আগস্ট ১৯৩৯ খ্রীঃ)। রাশিয়ার সংগে সন্ধি করেই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর-১৯৩৯ খ্রীঃ)। এই অবস্থায় ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

জাতি-সংঘ

(League of Nations)

উৎপত্তি

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের একটা প্রধান ফল হল জাতি-সংঘের প্রতিষ্ঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের সবাই স্থায়ী শান্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় বিশ্বের রাষ্ট্রবিদরা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উড্রো উইলসন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতি-সংঘের গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয় এবং পরের বছর আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতি-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

উদ্দেশ্য ও সংগঠন

বিশ্বের সব জাতি পরস্পরের সংগে আলাপ-আলোচনা করে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বিশ্বের শান্তি বজায় রাখবে এই ছিল জাতি-সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে বিজয়ী ও নিরপেক্ষ দেশগুলোকে নিয়ে জাতি-সংঘ গঠিত হয়; পরে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশও এতে যোগ দেয়। আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এই সংস্থার উদ্যোক্তা হলেও, তাঁর নীতি আমেরিকানরা গ্রহণ না করায় আমেরিকা এতে যোগদান করতে অসম্মত হয়। রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েট রাশিয়া জাতি-সংঘে যোগ দেয়। জাতি-সংঘের দপ্তর সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে অবস্থিত ছিল। একটি কাউন্সিল, একটি পরিষদ ও একটি কার্য সংসদ—এই তিনটি মূল সংস্থা নিয়ে জাতি-সংঘ গঠিত হয়। এছাড়া বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি মেটাবার জন্য হল্যাণ্ডের হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক আদালতের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বের শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরেরও প্রতিষ্ঠা হয়।

জাতি-সংঘের সাফল্য

জাতিসংঘ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিছু কিছু রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়। তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ বাধলে, জাতি-সংঘ মধ্যস্থতা করে তা মিটিয়ে দেয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে বিবাদ বাধলে তারা জাতি-সংঘের শরণাপন্ন হয়। জাতি-সংঘ এই বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দেয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে বুলগেরিয়া জাতি-সংঘে আবেদন করে। জাতি-সংঘের নির্দেশে গ্রীস যুদ্ধ বন্ধ করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার ক্ষেত্রে জাতি-সংঘ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। প্রাচ্য ভূমণ্ডলে কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করার ব্যাপারে জাতি-সংঘ কৃতিত্ব অর্জন করে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারেও জাতি-সংঘের যথেষ্ট অবদান ছিল।

ব্যর্থতা

কিন্তু যে আশা নিয়ে জাতি-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। তার কারণ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো সব সময় নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করত এবং এই কারণে তারা জাতি-সংঘের হাতে বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী ছিল না। জাতি-সংঘের চরম ব্যর্থতা দেখা যায় আবিসিনিয়ার ওপর ইটালীর আক্রমণে ও চীনের ওপর জাপানের আক্রমণে। জাতি-সংঘের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং এই সংস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে কেউ যত্নবানও ছিল না। জাতি-সংঘের নিজের সেনাবাহিনী না থাকায় অভিযুক্ত রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটাই হল জাতি-সংঘের প্রধান ত্রুটি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাতি-সংঘে যোগদান না করায় এবং জার্মানী ও জাপান এর সদস্যপদ ত্যাগ করলে জাতি-সংঘের গুরুত্ব কমে যায়। এই সব কারণে জাতি-সংঘের মর্যাদা কমে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

অনুশীলনী

১। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের 'প্রধান চারজন' কে ছিলেন ?

২। শান্তি-সম্মেলনের সামনে সমস্যা কি ছিল ? বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে উড্রো-উইলসনের আদর্শ কি ছিল ?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের পুনর্গঠন কিভাবে করা হয় ?

৪। মুসোলিনি ও হিটলার সম্বন্ধে কি জান ?

৫। মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুদয় কেন সম্ভব হয় ? তাঁদের দলগুলো কি নামে পরিচিত ছিল ?

৬। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্যোক্তারা কে ছিলেন ? ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে কি জান ?

৭। জাতি-সংঘের উৎপত্তি কিভাবে হয় ? এর সংগঠন কি ছিল ? জাতি-সংঘের সাফল্য সম্বন্ধে কি জান ? জাতি-সংঘের ব্যর্থতার কারণ কি ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের মূলে ছিল হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি। কিন্তু প্রশ্ন হল : জার্মান-জনগণ হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি কেন সমর্থন করেছিল ? এর উত্তর পেতে হলে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে ভার্সাই সন্ধিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর ওপর যে অবিচার ও অন্যায় করা হয়েছিল তা জার্মানরা কখনও ভুলতে পারে নি। জার্মানীর কিছু অংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও অন্য সব উপনিবেশ বিজয়ী শক্তিগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।

ভার্সাই সন্ধি ও জার্মানী

জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র এমনভাবে কমান হয়েছিল যে আত্মরক্ষা করার মত শক্তিও জার্মানীর ছিল না। জার্মানীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধের জন্য জার্মানীকেই একমাত্র দায়ী করে তার ওপর এক বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে জার্মানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। উপরন্তু জার্মানীর ভিতর দিয়ে পোলিশ-করিডোরের সৃষ্টি করে জার্মানীকে দুইভাগে ভাগ করা, জার্মানীর খনিজ প্রধান সার অঞ্চলের ওপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা ইত্যাদি ব্যবস্থায় জার্মানীর জাতীয় মর্যাদা যেভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছিল তা জার্মানরা কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারেনি। এমন কি প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে নিজের পক্ষ সমর্থন করার কোনও সুযোগ জার্মানীকে দেওয়া হয়নি এবং ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি তার ওপর এক রকম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই জার্মানী বিজেতা শক্তিগুলির এই আচরণে ও অন্যায় ব্যবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর অবস্থা এতই অসহায় ছিল যে ভার্সাই সন্ধির কঠোর ও অপমানজনক শর্তগুলি গ্রহণ করা ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তার পর থেকেই জার্মানী এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকে। জার্মানীর প্রতিশোধাত্মক মনোভাবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ।

জার্মানীর উগ্রজাতীয়তাবাদ যুদ্ধের আর এক কারণ। উগ্রজাতীয়তাবোধের প্রভাবেই জার্মানী অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীদের নিয়ে বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। জার্মানীর অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ তার উগ্র জাতীয়তাবাদের সাক্ষ্য দেয়।

জার্মানীর উগ্র-জাতীয়তাবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর এক কারণ হল জার্মানী, জাপান, ইটালী ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। অন্যদিকে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থা অনুযায়ী ইটালী ও জাপানকে যা দেওয়া হয়েছিল, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এই কারণে জার্মানী, ইটালী ও জাপান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে, ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে। জার্মানীও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়। সোভিয়েট রাশিয়া বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি দখল করতে ও বল্কানের ভিতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে প্রয়াসী হয়।

জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতি

জার্মানী, ইটালী ও জাপান যখন ধাপে ধাপে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার ফ্যাসীবাদী শক্তিদের বাধা না দিয়ে তাদের তোষণ করতেই বেশী ব্যস্ত হন। ব্রিটেনের এই তোষণ নীতির কারণ ছিল তার অর্থনৈতিক সংকট, সাম্যবাদের ভয় এবং জার্মানী ও ইটালীর আক্রমণাত্মক মনোভাব। অন্যদিকে ফ্রান্সের তোষণ-নীতির কারণ ছিল তার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অর্থনৈতিক সংকট, জার্মানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব ও রাশিয়া সম্পর্কে ভয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি ফ্যাসিবাদী শক্তিদের পররাজ্য-গ্রাসে ইন্ধন যোগায়। জার্মানীর জাতি-সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ, ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা; রাইন অঞ্চলে জার্মান-বাহিনীর মোতায়েন এবং অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া-গ্রাস প্রভৃতি ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নীরব থেকে মারাত্মক ভুল করে।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি জার্মানী, ইটালী ও জাপানের শক্তি

বাড়ায় ও তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তি' সম্পন্ন করে সমর-সজ্জা শুরু করে। এই চুক্তির সংবাদে এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দুর্বলতায় আতঙ্কিত হয়ে রাশিয়া জার্মানীর সংগে 'অনাক্রমণ চুক্তি'তে আবদ্ধ হয় (১৯৩৯ খ্রীঃ)। এর ফলে পূর্ব সীমান্তের দিক থেকে রাশিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হওয়ায় হিটলার নিশ্চিন্ত হন। তিনি দেখলেন যে ইটালী ও জাপান জার্মানীর সংগে মিত্রতায় আবদ্ধ; রাশিয়া নিরপেক্ষ, জাতি-সংঘ মৃতপ্রায় এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দুর্বল। এই অবস্থায় তাঁর আক্রমণাত্মক কাজকর্মে বাধা আসার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর দৃষ্টি পড়ল বাল্টিক সাগরের ডানজিগ বন্দর ও পোল্যাণ্ডের ওপর। তিনি ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডোর দাবি করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের মনোভাব বুঝতে পেরে ঘোষণা করেন যে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন পোল্যান্ডকে সাহায্য করবে। চেম্বারলেনের চেষ্টায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে এক চুক্তি সম্পন্ন হয়। ব্রিটেন পোল্যান্ড সম্পর্কে জার্মানীকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু হিটলার তা অগ্রাহ্য করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীঃ)। এই অবস্থায় দুদিনপর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল জার্মানী ও ইটালী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দুবছর পর জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। অপর পক্ষে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। মানব ইতিহাসের ভয়ংকরতম এই যুদ্ধ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই চলে ছয় বছর ধরে। এই যুদ্ধে জার্মানী, ইটালি এবং জাপান পরাজিত হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমায় জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নামের দুই সমৃদ্ধ জনপদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে পুরোণ সব সমস্যার সমাধান হয়; কিন্তু সেই সংগে আবার নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া তাদের আদর্শগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে

ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমেত পশ্চিমী শক্তিগুলো ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আবার বিবাদ শুরু হয়। আগের মতই বিশ্ব আবার দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে দুই দলের মধ্যে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামরিক প্রস্তুতি চলছে। এক দলে আছে সোভিয়েট রাশিয়া ও আরও কয়েকটি সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্য দলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তাদের মিত্ররা। এই দুই দলের মাঝখানে একটি নিরপেক্ষ দল আছে—ভারত তার মধ্যে প্রধান। এই নিরপেক্ষ দলের লক্ষ্য হল দুই দলের মধ্যে সব বিষয়ের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বে ইউরোপের প্রতিপত্তি অনেক কমে গেছে এবং ইউরোপ সমস্যা সংকুল মহাদেশে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের বড় বড় শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় বিশ্বের রাজনীতিতে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। যুদ্ধের ফলে জার্মানী দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে—পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী। যুদ্ধের ফলে ইটালীতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় এবং অনেক দেশ একের পর এক স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর চেষ্টায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশ্বে শান্তি বজায় রেখে সব দেশের মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাণ সাধন করা।

অনুশীলনী

১। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর ওপর কি অবিচার করা হয়েছিল ? তার ফলাফল কি হয় ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নির্দেশ কর। এই যুদ্ধের জন্য কি জার্মানীকেই একমাত্র দায়ী করা যায় ?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দায়িত্ব আলোচনা কর।

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯১৯-১৯৪৭)

ষোড়শ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

ভূমিকা ঃ আমরা আগেই দেখেছি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ইংরাজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। ভারতবাসী তথা গান্ধীজীর আশা ছিল যে যুদ্ধের পর ভারতবাসীর এই সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবেন। কিন্তু যুদ্ধের পর খাদ্যের অভাব, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, জাতীয়তাবাদীদের ওপর সরকারের দমননীতি, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি নানা কারণে গান্ধীজী তথা ভারতবাসীর মন হতাশায় ভরে ওঠে। ভারতবাসী ইংরাজ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা হারায়। 'মণ্ট-ফোর্ড' আইন ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের সর্বত্র ভারতবাসীর চাপা অসন্তোষ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

ভারতের সেই সময়ের পরিস্থিতি ও ইংরাজ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস-অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেস তা সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এই প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী

কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনা ; কারণ কংগ্রেস—সরকারের কাছে 'রাজনৈতিক ভিক্ষা'-র নীতি চিরতরে বর্জন করে সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে। গান্ধীজী দেশবাসীকে আশ্বাস দেন যে যদি তারা তাঁর কর্মসূচী

মহাত্মাগান্ধী

ঠিকমত পালন করে, তাহলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ সুনিশ্চিত। অসহযোগ-আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল—সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, জাতীয় স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা, আইন-সভা ও আদালত বর্জন, বিদেশী জিনিসপত্র বর্জন, খদ্দরের প্রচলন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ়ীকরণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসভাবে অবিচলিত থেকে প্রতিপক্ষের অন্তর জয় করাই অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজীর আত্ম-ত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে সাধারণ মানুষ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলো তুরস্কের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেছিল। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্মনায়ক বা 'খলিফা'। খলিফার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও তারা খিলাফত্ আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজীর পরিচালনায় খিলাফত্ আন্দোলন ও অসহযোগ-আন্দোলন মিলে মিশে এক হয়ে যায়। ফলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে। চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, আবুল-কালাম আজাদ,

চিত্তরঞ্জন দাস　　মতিলাল নেহেরু

লালা-লাজপৎ রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাস চন্দ্র বসু প্রভৃতি বড় বড়

নেতারাও গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেন। গান্ধীজীর আহ্বানে উকিল-ব্যারিস্টার আদালত ত্যাগ করেন, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছাড়ে, শ্রমিকরা কল-কারখানা ত্যাগ করে এবং সব জায়গায় স্বদেশী জিনিসের ব্যবহারের হিড়িক পড়ে যায়। এই সময় যাদবপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিদ্যালয়টি আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বিদেশী জিনিসের দোকানে পিকেটিং বা অবরোধ চালিয়ে দলে দলে মানুষ জেলে যায়। সেই সঙ্গে সরকারের দমন-নীতিও পুরোদমে চলতে থাকে। সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে এক উত্তেজিত জনতা উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামে এক থানায় আগুন লাগিয়ে কয়েকজন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। গান্ধীজী অহিংসভাবেই আন্দোলন চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু চৌরিচৌরা-র ঘটনায় তিনি মর্মাহত হন এবং আন্দোলন বন্ধ করে দেন (১৯২২ খ্রীঃ)।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয় নি। এর ফলে জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। স্বাধীনতা-আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন

অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ হলেও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কৃষকদের দাবি ছিল জমিদারি-প্রথা বিলোপ করা, খাজনা ও অন্য সব করের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া, জমি থেকে উৎখাত বন্ধ করা ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করা। উত্তর প্রদেশে প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এলাহাবাদের কাছে প্রতাপগড়ের কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ও মিছিল করে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে থাকে। জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর কিছু সহকর্মী এলাহাবাদের কিছু গ্রাম ঘুরে দেখেন। গ্রামের মানুষের মনে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখে তিনি অভিভুত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকরা রাইবেরিলী, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহী

হয়ে ওঠে, পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে ও বহু কৃষক প্রাণ হারায়। কৃষকবিদ্রোহ গুজরাট, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের কৃষকরা খাজনা না দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করে। সরকারের অত্যাচার সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত কৃষকরা জয়ী হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় 'কিষাণ-সভা'-র প্রতিষ্ঠা হলে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে।

কৃষক-অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-অসন্তোষও প্রবল হয়ে ওঠে। সে সময় কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন ছিল খুবই কম; তাদের জীবন যাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন ও কাজের সময় ছিল দীর্ঘ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটগুলো রাজনীতির ওপর বেশ প্রভাব ফেলে। বোম্বাই ও দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে সুতোকলের 'গিনি কামগার ইউনিয়ন' নামে শ্রমিক সংঘের প্রভাব খুবই বেড়ে যায়। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ-মারাঠা রেলের শ্রমিক ইউনিয়ন বা সংঘগুলো বিদ্রোহের শপথ নেয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলে কলকারখানা ও রেলের শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। দেশের অনেক জায়গায় কৃষি-মজদুর সংঘ গড়ে ওঠে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে হরতাল পালিত হয়েছিল (১৯২৭ খ্রীঃ) তাতে শ্রমিক সংঘগুলো অংশ গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলো যেমন 'কীর্তি', 'মজদুর', 'কিষাণ' ইত্যাদি শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গপুরে রেলকর্মীদের এক ব্যাপক ধর্মঘট হয়। জামশেদপুরে টাটার কারখানার কর্মীরাও ধর্মঘট করে। সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এই ধর্মঘটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে মুজফ্ফর আহমেদ, ডাঙ্গে, পি-সি-যোশী প্রভৃতির নাম করা যায়।

আইন-অমান্য আন্দোলন

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতারা সরকারের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু কংগ্রেসের দুই নবীন

নেতা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবাদ করে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁদের একমাত্র দাবি ছিল 'পূর্ণ স্বরাজ'। তাঁরা দুজনেই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জোর প্রচার শুরু করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়। কংগ্রেস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই অধিবেশনে জওহরলাল পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার দাবি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সময় থেকে এই তারিখটি স্বাধীনতা-দিবস হিসাবে পালন করা হতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই তারিখটি 'প্রজাতন্ত্র-দিবস' হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

ইংরাজ সরকারের দমন-নীতি, সারা দেশজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি কারণে গান্ধীজী অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ লবণ-আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী গুজরাটের সবরমতি আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন। ২৪১ মাইল রাস্তা পেরিয়ে তিনি সমুদ্রের উপকূলে ডাণ্ডী নামে এক জায়গায় আসেন। সারা পথে পল্লীবাসী ও শহরবাসীরা লবণ সত্যাগ্রহীদের বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। গান্ধীজী নিজের হাতে সমুদ্রের জল তুলে লবণ তৈরীর কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে সত্যাগ্রহীরাও লবণ তৈরীর কাজে লেগে যায়। এইভাবে লবণ-আইন অমান্য করা হলে সারা দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বাংলার চব্বিশ-পরগণা জেলার মহিষবাথান ও মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে আন্দোলন প্রবল হয়। বিদেশী কাপড়ের দোকানে ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করার ভার গান্ধীজী নারীদের ওপর দেন। অনেক জায়গায় বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন করা হয়। সেই সঙ্গে ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। ভারতের ভিতরে যখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অহিংসবাদী নেতা খান আব্দুল গফ্ফর খাঁর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন খোদা-ই-খিদমৎগার (অর্থ হল ঈশ্বরের সেবক) দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। গান্ধীজীর অহিংস-নীতিতে গফ্ফর খাঁর খুব আস্থা ছিল। তিনি 'সীমান্ত-গান্ধী'

নামেও পরিচিত। দুর্ধর্ষ পাঠানদের মধ্যে তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করেন। সীমান্ত প্রদেশের এই আন্দোলন দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। পেশোয়ারে সত্যাগ্রহীদের ওপর প্রচণ্ড গুলি চালান হয়। যার ফলে শত শত মানুষের প্রাণহানি হয়। বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি নানা জায়গায় আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সেই সংগে সরকারের দমননীতিও কঠোর হয়। -সব জায়গায় সত্যাগ্রহীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলে। গান্ধীজী সমেত কংগ্রেসের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আইন-অমান্য আন্দোলনে বিচলিত হয়ে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। গান্ধীজী সমেত সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা হয় এবং ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সংগে গান্ধীজীর এক চুক্তি হয় যা "গান্ধী-আরউইন চুক্তি" নামে খ্যাত (১৯৩১ খ্রীঃ)। কিন্তু ইংরাজ সরকার কেন্দ্রে ও প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গঠনে অসম্মত হলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করে (১৯৩২-৩৪ খ্রীঃ)। উত্তরপ্রদেশে কৃষকরা সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। এই কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন জওহরলাল নেহরু। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তিন তরুণ বিপ্লবী বিনয়, বাদল, দীনেশ রাইটার্স-বিল্ডিং অভিযানে অগ্রসর হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। সরকারও দমন-নীতি চালিয়ে যান। আবার গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও সেই সংগে কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করা হয়। যথেচ্ছভাবে লাঠি চালনা, গুলি চালনা, পাইকারী জরিমানা কিছুই বাদ পড়ল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছয় মাস ধরে একটানা আন্দোলন চলতে থাকে। গান্ধীজী মুক্তি লাভ করে আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

'ভারত ছাড়'-আন্দোলন

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানীর সাফল্য ও জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণে ব্রিটেনের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ভারতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই জাপান মিত্রপক্ষের (অর্থাৎ ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি) বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলে মিত্রপক্ষের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। জাপান

কয়েকবার ভারতও আক্রমণ করে। ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতের সংগে বোঝাপড়া করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠান। ক্রীপস্‌ ভারতীয় নেতাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। কিন্তু ক্রীপস্‌-এর প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কোন উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেস তা বাতিল করে। অন্যদিকে ক্রীপস্‌-এর প্রস্তাবে পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের ইংগিত না থাকায় মুসলিম লীগও তা বাতিল করে।

ক্রীপস্‌-এর মিশন বা দৌত্য ব্যর্থ হলে মহাত্মাগান্ধী ইংরাজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' (**'Quit India'**) প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতের মংগলের জন্য এবং জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (**United Nations**) সাফল্যের জন্য ইংরাজদের উচিত ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই সরকার গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সারা দেশে 'ভারত ছাড়' ধ্বনি মুখরিত হয়ে ওঠে। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে গণ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে ও ডাকঘর পুড়িয়ে ফেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করা হয়। সরকারী অফিস ও আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করে শত শত মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। বাংলার মেদিনীপুর জেলার জনগণ এক অভূতপূর্ব বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দেয়। মাতংগিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরা-র নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। উৎপীড়ন, অত্যাচার ও গোলাগুলির সাহায্যে সরকার এই বিদ্রোহ দমন করেন। এই আন্দোলন 'আগস্ট-আন্দোলন' নামেও খ্যাত।

আজাদ হিন্দ

ভারতের ভেতরে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন যখন ম্লান হয়ে আসছিল, সে সময় ভারতের বাইরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের এক বড়

নেতা। গান্ধীজীর সংগে তিনি সব বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাঁর পথ ছিল বিপ্লবের পথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। তিনি ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালিয়ে যান (১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ খ্রীঃ)। তিনি আফগানিস্থান ও রাশিয়ার ভেতর দিয়ে জার্মানীতে আসেন। ইংরাজদের শত্রু জার্মানরা সুভাষচন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করে। সে সময় জার্মানদের হাতে কিছু ভারতীয় সৈন্য বন্দী ছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা তাঁর সংগে যোগ দেয়। জার্মান-সরকার সুভাষচন্দ্রকে কিছু সাহায্যও করেন। এরপর সুভাষচন্দ্র জাপানে আসেন। জাপান-সরকারও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই সময় ঘটনাচক্রে সিংগাপুরে আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠনের সূত্রপাত হয়। ভারতের এক খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ছিলেন আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। সৈন্যদের স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়। এই মন্ত্র ছিল একতা, আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ। জাপানেই সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংগাপুরে এলে এক বিরাট ভারতীয় জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি বলে ঘোষণা করা হয় ও 'নেতাজী' বলে অভিনন্দিত করা হয়। 'দিল্লী চলো' এই ডাক দিয়ে নেতাজী আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মধ্যে এক গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। তিনি এই বাহিনীতে নারী ও পুরুষ দু রকমের বাহিনী গঠন করেন। 'ঝাঁসীর রানী'-নামে এক পৃথক নারী ব্রিগেডও গঠন করা হয়।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠন

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর নেতাজী আজাদ-হিন্দ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। নেতাজী হলেন এই সরকারের সর্বাধিনায়ক। এই সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রবাসী ভারতীয়রা অকাতরে এই সরকারকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় 'দিল্লী-চলো' প্রস্তুতি।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী আজাদ-হিন্দ বাহিনী নিয়ে রেংগুনে আসেন। সে সময় ব্রহ্মদেশ ছিল জাপানীদের দখলে। এর পর শুরু হয় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর ভারত যাত্রা। এই বাহিনী মউডক নামে ভারত-

সীমান্তে ব্রিটিশ সেনা-শিবিরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেয়।

'দিল্লী চলো' অভিযান

আজাদ-হিন্দ সেনাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 'দিল্লী-চলো' ধ্বনি মুখে রেখে আজাদ-হিন্দ বাহিনী অগ্রসর হয়ে মণিপুরের রাজধানী ইংফল দখল করে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের মাটিতে প্রথম উত্তোলন করে এই বাহিনী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় আমেরিকা বিরাট যুদ্ধ সম্ভার নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায়। জাপানের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ-হিন্দ বাহিনীকেও পিছু হটতে হয়। প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন, খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও এই বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজাদ-হিন্দ বাহিনী ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব, দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি একদিকে ইংরাজ সরকারের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে ও অন্যদিকে ভারতবাসীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। দিল্লীর লাল কেল্লায় এই বাহিনীর নেতাদের বিচারের সময় দেশময় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় নৌ-বাহিনী বিদ্রোহী হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ইংরাজ সরকারের পুলিশ ও আমলাদের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব উগ্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেশের নানা জায়গায় ধর্মঘট, হরতাল ও আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরাজ সরকার বুঝতে পারেন যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা ছাড়া অন্য পথ নেই।

ভারতের গণমনে প্রতিক্রিয়া

ভারতবাসীর সঙ্গে মিটমাট করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে এক ব্রিটিশ

মন্ত্রী-মিশন ভারতে আসেন (১৯৪৬ খ্রীঃ)। মন্ত্রী-মিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতের শেষ ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি ভারত বিভাগের কথা ঘোষণা করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়।

অনুশীলনী

১। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ বলতে কি বোঝায়? তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আদর্শ রাজনীতিতে কিভাবে প্রয়োগ করেন?

২। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল? এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল?

৩। ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান? কয়েকজন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতার নাম কর।

৪। আইন-অমান্য আন্দোলনের কারণ কি? এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। সীমান্ত-গান্ধী কাকে বলা হয়? আইন-অমান্য আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কি ছিল?

৭। ইংরাজ সরকারকে 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব কেন দেওয়া হয়? কে এই প্রস্তাব প্রথম দেন?

৮। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? 'দিল্লীচলো'-র আহ্বান কে দেন? আজাদ-হিন্দ-বাহিনী ভারতের গণমনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল?

১০। ভারতের হাতে ক্ষমতা কি ভাবে হস্তান্তর করা হয়?

(ক) চীনের প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন

আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে চীনের জাতীয়তাবাদীগণ চীনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু চীনের বিপ্লবী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই সুযোগে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীলরা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নতুন প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সান-ইয়াৎ-সেন স্বেচ্ছায় সমর-অধিনায়ক ইউয়ান-শি-কাই-এর অনুকূলে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

ইউয়ান-শি-কাই ছিলেন ঘোর স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হয়েই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতেই বেশী মনোযোগী হন। তিনি বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র নানকিং থেকে রাজধানী পিকিং-এ সরিয়ে আনেন। সেখানে প্রতিক্রিয়াশীলরা ছিল বেশী শক্তিশালী ও সুগঠিত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সফল হলেও কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় তারা বিদ্রোহী হয় ও জমিদারদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। সেই সঙ্গে শ্রমিকরাও বিদ্রোহী হয়। কিন্তু ইউয়ান-শি-কাই এই সব বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ খুব সহজেই দমন করেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইউয়ানকে সাহায্য করে যায়। চীনের এই অবস্থা দেখে সান-ইয়াৎ-সেন অত্যন্ত মর্মাহত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন বিপ্লবী লীগের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে 'কুয়ো-মিন-তাং' নামে এক নতুন জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। কিন্তু ইউয়ান-শি-কাই-এর তা মনঃপূত হল না। ইউয়ান নিজের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলে সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ইউয়ানের সংঘর্ষ শুরু হয়। ইউয়ান চীনের নতুন সংসদে ও সংসদের বাইরে কুয়ো-মিন-তাং দলের অনুগামীদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। সংসদ থেকে কুয়ো-মিন-তাং দলের প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করেন। এরপর ইউয়ান সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হন। এর ফলে চীনের প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন ধরে এবং তা ইউয়ান-শি-কাই ও সান-ইয়াৎ সেন-এর মধ্যে প্রায় ভাগ হয়ে যায়।

যোদ্ধা-গোষ্ঠীর কবলে চীন

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান-শি-কাই-এর মৃত্যু হলে চীনে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম

হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নামে মাত্র থাকেন বটে কিন্তু রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা 'তু-চুন' নামে যোদ্ধৃ-গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। এঁরা ছিলেন প্রদেশের সামরিক শাসনকর্তা। প্রভুত্ব লাভের জন্য তু-চুনরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার ব্যাপারেই বেশী মনোযোগী হন। তাঁরা নিজেদের এলাকায় কর ধার্য করে তা নির্বিচারে আত্মসাৎ করতে থাকেন। তু-চুনদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার শাসক চ্যাং-সো-লিন।

দেশের এই দুরবস্থার সময় দক্ষিণ-চীনে কুয়ো-মিন-তাং দল পুনর্গঠিত হয়। এর নেতারা উত্তর-চীনের যোদ্ধৃ-গোষ্ঠীর সংগে কোন রকম আপোষ না করে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টন শহরে এক সাংবিধানিক সরকার গঠন করেন। তাঁরা সান-ইয়াৎ-সেনকে চীন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচন করেন। সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে কুয়ো-মিন-তাং দল উত্তর-চীনের যোদ্ধৃ-গোষ্ঠীর সংগে আপোষ করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে যত্নবান হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যোদ্ধৃ-গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সান-ইয়াৎ-সেন সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য নেন। সোভিয়েট রাশিয়াও প্রথম থেকেই চীনের জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করতে আগ্রহী ছিল। সান-ইয়াৎ-সেন-এর আমন্ত্রণে সোভিয়েট সরকার মাইকেল বরোডিন নামে কূটনীতিককে চীনে পাঠান। বরোডিনের চেষ্টায় কুয়ো-মিন-তাং দল নতুন জীবন-শক্তি লাভ করে। রুশ সামরিক বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় চীনে এক নতুন সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনে জার্মানীর অধিকৃত এলাকা সাণ্টুং জাপান দখল করে নেয়। যুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীন সাণ্টুং ফিরে পাওয়ার দাবি করে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে চীনকে সাণ্টুং ফিরিয়ে দেওয়ার কোন শর্ত না থাকায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে পিকিং-এ এক ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার

৪ঠা মে-র আন্দোলন

ছাত্র-ছাত্রী "সাণ্টুং ফিরিয়ে দাও" এই দাবিতে পিকিং ও অন্যান্য শহরে পদযাত্রা ও মিছিল করে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা করে। বিভিন্ন শহরে ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ছাত্ররা চীন সরকারের মন্ত্রিদের পদত্যাগ দাবি করেও অনেক জায়গায় সরকারী কর্মচারীদের বাড়ী অবরোধ করে। ছাত্রদের সংগে যোগ দেয় চীনের বণিক ও শিল্পী সংঘগুলো। চীনের সব জায়গায়

জাপানী পণ্য সামগ্রী বয়কট করা হয়। শেষ পর্যন্ত এই ছাত্র আন্দোলন প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে।

চীনের এই ছাত্র জাগরণ সান-ইয়াৎ-সেনকে নতুন করে উৎসাহ দেয়। তিনি ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁর তিন দফা আদর্শ বা কর্মসূচী জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগ পান। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিরা।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন চীন-বিপ্লবের জনক। তাঁর তিন দফা কর্মসূচী চীনের জনসাধারণের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল। প্রথমটি হল জাতীয়তাবাদ। এত দিন পর্যন্ত জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ চীনাদের কাছে অজানা ছিল।

সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৌলিক আদর্শ

সান-ইয়াৎ-সেন-এর জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের ঐক্যের ওপর দেশপ্রেমের বুনিয়াদ গড়ে তোলা। তাঁর দ্বিতীয় আদর্শ বা কর্মসূচী ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাঁর তৃতীয় আদর্শ বা কর্মসূচী ছিল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। প্রকৃতপক্ষে সান-ইয়াৎ-সেন-এর এই তিনটি আদর্শের ভিত্তির ওপর চীনের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শুরু হয়।

কুয়ো-মিন-তাং ও চীনের কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের সাফল্য ঘটলে চীনের কিছু বুদ্ধিজীবী মার্কসীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরা মার্কসের আদর্শ ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য ক্লাব বা সংস্থা গঠন করেন। ক্রমে সাম্যবাদ চীনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পিকিং ও সাংহাই-এ কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীদের এই গোষ্ঠীই প্রকৃতপক্ষে চীনে কমিউনিস্ট দলের ভিত্তি রচনা করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাংহাই-এ চীনা কমিউনিস্ট দলের প্রথম কংগ্রেসের বৈঠক বসে। এই সময় কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন লি-লি-সান ও মাও-সে-তুং। কুয়ো-মিন-তাং দলের ওপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা কুয়ো-মিন-তাং-এ যোগ দেয়। মাইকেল বরোডিনের চেষ্টায় রুশ কমিউনিস্ট দলের অনুকরণে কুয়ো-মিন-তাং দল পুনর্গঠন করা হলে চীনা কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। কিন্তু কুয়ো-মিন-তাং-এর দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী কমিউনিস্টদের মোটেই বিশ্বাস করত না। এমন কি তারা রাশিয়ার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করারও পক্ষপাতী ছিল। সান-ইয়াৎ-সেন কুয়ো-মিন-তাং-এর দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেন। সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মোটামুটি শান্তিপূর্ণই ছিল। সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যুর পর চিয়াং-কাইশেক কুয়ো-মিন-তাং দলের নেতা হন। তিনি ছিলেন উগ্র দক্ষিণপন্থী এবং এই কারণে তিনি কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমেই কুয়ো-মিন-তাং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে দেন।

কুয়ো-মিন-তাং দল তথা চিয়াং-সরকারের সংগে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। চিয়াং-সরকারকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা গোলমাল শুরু করে। এগুলোর মধ্যে নানকিং-এর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর চীনের যোদ্ধা গোষ্ঠীকে দমন করার জন্য ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং কাইশেক উত্তর-চীন অভিযান শুরু করেন, এবং সাংহাই ও নানকিং দখল করেন (১৯২৭ খ্রীঃ)। চিয়াং কাইশেকের জাতীয়বাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একদল সেনা নানকিং-এ এক পৃথক সরকার গঠন করে বিদেশীদের উপর অত্যাচার শুরু করে যা নানকিং ঘটনা (১৯২৭ খ্রীঃ) নামে খ্যাত। এই ঘটনার ফলে চিয়াং-সরকারের সংগে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং জাপান কয়েক হাজার সেনা চীনে নিয়ে আসে। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের কুয়ো-মিন-তাং দল থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর শুরু হয় তাঁর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান। তিনি সাংহাই-এ কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ দমন করেন এবং দেশের নানা জায়গায় কমিউনিস্টদের হত্যা করেন। এর ফলে কমিউনিস্টদের সংগে জাতীয়তা-বাদীদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা দেখে চিয়াং-সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সুতরাং তাদের ধ্বংস করার জন্য চিয়াং কাইশেক এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যান ও কমিউনিস্টদের লালফৌজকে পরাস্ত করেন। বিপদের আশংকা করে মাও-সে-তুং ও চু-তে কমিউনিস্টদের একত্রিত করে উত্তর-পশ্চিমে কমিউনিস্ট বাহিনীর সংগে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় ছয় হাজার

মাইল দীর্ঘ পথে যাত্রা শুরু করেন (১৯৩৪ খ্রীঃ)। পথে বহু কমিউনিস্টের মৃত্যু হয়। শেষে তাঁরা ইয়েনান প্রদেশে এসে পৌঁছায়। এই দীর্ঘ পথ যাত্রা ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা এবং তা লং মার্চ নামে খ্যাত।

এই সময় জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করলে চীনে এক দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। এই অবস্থায় এক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তির ওপর কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী সরকারের সংগে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু চিয়াং কাইশেক জাপানকে প্রতিরোধ না করে কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। চিয়াং কাইশেকের এই নীতি তাঁর অনুগামীদের পছন্দ হল না। চিয়াং-কাইশেক সিয়াং-ফু-তে আসলে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অনুগামী চিয়াং কাইশেককে হঠাৎ বন্দী করেন (১৯৩৬ খ্রীঃ)। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্টদের সংগে মিলেমিশে জাপানীবাহিনীকে প্রতিরোধ করা। শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাইশেককে মুক্ত করা হয় এবং তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করেন।

সিয়াং-ফু ঘটনা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চীনের ওপর জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্টরা বারবার চিয়াং-কাইশেকের সংগে এক বোঝাপাড়ায় আসার চেষ্টা করে যেতে থাকে। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান-মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকদেন দখল করে। চিয়াং-সরকার জাপানকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে কমিউনিস্টদের দমন করতেই বেশী তৎপর হন। স্বদেশের শত্রু জাপানকে বাধা দেওয়ার জন্য মাও-সে-তুং চিয়াং-সরকারের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু চীন সরকার তা না করে কমিউনিস্টদের ওপরই আক্রমণ চালান। ফলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহী হয়ে উত্তর-পশ্চিম চীনে স্থানীয় সোভিয়েট গঠন করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান নতুন করে চীন আক্রমণ করলে চীন সরকার ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মীমাংসা হয়। কুয়ো মিন-তাং ও কমিউনিস্ট-এই দুই দলকে নিয়ে 'জনগণের রাজনৈতিক সমিতি' নামে এক সংস্থা গঠন করা হয়। জাপানের বিরুদ্ধে কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হলে চীনের সংগে রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জাপান-জার্মানীর দলে যোগ দেয় ও চীন মিত্রপক্ষে

জাপানের আক্রমণ ঃ কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সম্পর্ক

যোগ দেয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংগীভূত হয়ে পড়ে।

চীনের গৃহযুদ্ধ

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে চীনে কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে নতুন করে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দল কুয়ো-মিন-তাং দলের সংগে মিলেমিশে জাপানের সংগে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে কমিউনিস্টরা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা থাকায় জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জাপানের পরাজয়ের পর কুয়ো-মিন-তাং দলের সংগে কমিউনিস্টদলের আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। কুয়ো-মিন-তাং সরকারের নেতৃত্ব করতেন চিয়াং কাইশেক এবং ধনী জমিদার ও বণিকেরা। চীনের অধিকাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। কুয়ো-মিন-তাং দলের কুশাসনে জনসাধারণ ছিল জর্জরিত। অন্যদিকে মাও-সে-তুং, চু-তে, চু-এন-লাই প্রভৃতি নেতাদের পরিচালনায় চীনের কমিউনিস্ট দল ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই কারণে চীনের এই গৃহ যুদ্ধে জনসাধারণ কমিউনিস্টদের পক্ষে যায় এবং তাদের নানাভাবে সাহায্য করে। চিয়াং কাইশেকের জাতীয়বাহিনী কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে একের পর এক শহর দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চিয়াং কাইশেকের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ও কমিউনিস্ট দল রাজধানী পিকিং দখল করে। চিয়াং কাইশেক তাঁর দলবল নিয়ে ফরমোজা (তাইওয়ান) দ্বীপে আশ্রয় নেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাও-সে-তু-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখণ্ডে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

মাও-সে-তুং

(খ) ১৯৪৫ সালের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব

ভারতের পূর্বে, চীনের দক্ষিণে ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের ভূখণ্ডকে সাধারণ ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলা হয়। মূল ভূখণ্ড ছাড়া অনেক-গুলো ছোট বড় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এশিয়ার এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চল অনুন্নত হলেও, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, যা ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি বড় বড় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এই অঞ্চলে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সেই সঙ্গে তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ নির্বিবাদে চলতে থাকে। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই যুদ্ধের সময় জাপান : ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলো দখল করে নেয়। জাপানের পরাজয়ের পর প্রচুর জাপানী অস্ত্রশস্ত্র এ সব দেশের মানুষের হাতে এসে পড়ে। এক দিকে জাপানী অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যদিকে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর নিজেদের সংকট — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন মানুষের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

ভূমিকা

ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন : কাম্বোডিয়া, লাওস, কোচিন-চীন, আনাম, এবং টংকিং নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ হো-চি-মিন নামে এক জাতীয়তাবাদী নেতার নেতৃত্বে সেখানে প্রথম সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগ নামে এক সাম্যবাদী বিপ্লবী দল গঠন করে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় জার্মানীর কাছে ফ্রান্সের পতন ঘটলে (১৯৪০ খ্রীঃ) জাপান সেই সুযোগে ইন্দোচীন দখল করে নেয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে জাপানের শাসন চলতে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎমিন নামে জাতীয় বাহিনীর মুক্তি সংগ্রামও চলতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের পরাজয় ঘটলে হো-চি-মিন টংকিং এর রাজধানী হ্যানয় দখল করে আনাম ও কোচিন-চীনে তাঁর দলের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। হো-চি-মিন টংকিং, আনাম ও কোচীন-চীন একত্র করে ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন হো-চি-মিন। জাপানের পরাজয়ের পর ফ্রান্স আবার ইন্দোচীন দখল করার চেষ্টা করে।

ইন্দোচীন

ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য ফ্রান্স আনামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাওদাই-এর নেতৃত্বে ভিয়েৎনামে এক ফরাসী তাঁবেদার সরকার গঠন করেন। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী ভিয়েৎ-মিন দল ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ফ্রান্স সাম্যবাদীদের দমন করতে ব্যর্থ হয়। শেষে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিয়েৎনামকে দুভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। আনাম ও টংকিং সমেত উত্তর ভিয়েৎনামে প্রতিষ্ঠিত হল হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী সরকার ও রাজধানী হল হ্যানয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রতিষ্ঠিত হল ফরাসী প্রভাবাধীন বাওদাই সরকার ও রাজধানী হল সায়গন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাওদাই সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন ও সেখানে এক প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। কাম্বোডিয়া ও লাওসকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করা হল।

সুমাত্রা, জাভা, বালি, সিলিবিস ও অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠিত। ইন্দোনেশিয়া ছিল ওলন্দাজ সাম্রাজ্যভুক্ত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুকর্ণ-এর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় থেকে সেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর কাছে হল্যাণ্ডের পতন ঘটলে, ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে এবং সুকর্ণ-এর সহযোগিতায় এক সরকার গঠন করে। কিন্তু জাপানের মতিগতি দেখে ডঃ সুকর্ণ ও জাতীয়তাবাদীদল হতাশ হন এবং তাঁরা একসঙ্গে ওলন্দাজ ও জাপানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র করে তোলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে জাপান আত্মসমর্পণ করলে ডঃ সুকর্ণ-এর নেতৃত্বে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি (লিংগাদজাতি চুক্তি) অনুসারে হল্যাণ্ড জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরার ওপর ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু হল্যাণ্ড এই চুক্তি মেনে চলার পরিবর্তে তা বানচাল করতেই বেশী উদ্যোগী হয় ফলে সেখানে আবার গোলমাল শুরু হয়। শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া এক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইন্দোনেশিয়া

মালয় উপদ্বীপ এবং সিংগাপুর, পেনাং, সারাওয়াক, সাবা প্রভৃতি

দ্বীপ নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে মালয় উপদ্বীপ ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মালয় দখল করে নেয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন মালয় পুনরুদ্ধার করে সেখানে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সাম্যবাদী তৎপরতার জন্য এই প্রস্তাব কার্যকর করতে কিছু দেরী হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এগারোটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে মালয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় এবং মালয়কে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরে ব্রিটিশ অধিকৃত সিংগাপুর, উত্তর বোর্ণিও এবং সারাওয়াক মালয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলে মালয়েশিয়া নামে এক বৃহত্তর স্বাধীন যুক্ত-রাষ্ট্র গঠিত হয়।

মালয়েশিয়া

পশ্চিমে ভারত ও পূর্বে চীন ও থ্যাইল্যান্ড দিয়ে পরিবেষ্টিত ব্রহ্মদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর এক অন্যতম দেশ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ব্রহ্মদেশ জয় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংগীভূত করে। পঞ্চাশ বছর পরে ব্রহ্ম-দেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্রিটেনের এক স্বতন্ত্র উপনিবেশে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশের এক বিপ্লবী দল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানকে সাহায্য করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে এবং বর্মীদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। ডঃ বা-ম নামে এক নেতার নেতৃত্বে জাপানীরা ব্রহ্মদেশে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে। কিছুদিনের মধ্যেই বর্মীরা জাপানের কপটতা বুঝতে পেরে জাপান-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জেনারেল অং-সান্। অং-সানের নেতৃত্বে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এক স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করে স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু অং-সান পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয় যে এক সংবিধান-সভার নির্বাচন হবে এবং এই সভা দেশের ভবিষ্যৎ স্থির করবে। সেই বছরে সংবিধান সভা ব্রহ্মদেশকে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক আইন পাশ করে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

ব্রহ্মদেশ

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

এশিয়া ও আফ্রিকার বেশীর ভাগ দেশই ছিল ইউরোপীয়দের শাসনাধীন। এই সব পরাধীন দেশ নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতার আন্দোলন আমরা আগেই দেখেছি। পরাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা আফ্রিকা মহাদেশেও ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের সেই সুযোগ এনে দেয়। এই যুদ্ধের সময় ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। ইউরোপের যুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার সেনাদের যোগদানের ফলে এই দুই মহাদেশের জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়। আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সংখ্যালঘু ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ, ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন জাতি এবং দেশগুলোর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বার বার ঘোষণা করে। আতলান্তিক সনদে-ও এই আদর্শের কথা প্রচার করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরাধীন জাতিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় পরাধীন জাতিগুলোর মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সাফল্য পরাধীন দেশগুলোকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ইউরোপের পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক শক্তি সফল হয়। আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনভুক্ত দেশগুলোতে উপনিবেশ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন একই সঙ্গে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল উপনিবেশে মামাদুদিয়া ও লিওপোল্ড সেংগার নামে দুই জাতীয়তাবাদী নেতার পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। পূর্ব-আফ্রিকায় জুলিয়াস নিরেরা-র পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। যুদ্ধের সময় উত্তর-আফ্রিকার আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক

ও স্বাধীনতার আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যুদ্ধের আগেই সাম্যবাদী দল গড়ে ওঠে ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার নগরে উপনিবেশ-বিরোধী সর্ব-আফ্রিকা ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পর থেকেই আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

আতলান্তিক সনদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও বীভৎসতা বিশ্বের মানুষের মনে এক দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ইউরোপের রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে যে শান্তি-স্পৃহা জেগে ওঠে তার ফল দেখা যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠায়। বিশ্বে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আতলান্তিক মহাসাগরে এক জাহাজে মিলিত হন। আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা আতলান্তিক-সনদ নামে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন (১৯৪১ খ্রীঃ)। পরের বছর ২৬টি দেশ এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। এই দেশগুলোর মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। আতলান্তিক সনদ এইভাবে স্বাক্ষরিত হলে তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত হয়। আতলান্তিক সনদে আটটি শর্ত ছিল : কোন রাষ্ট্র কোন রকমের বিস্তারনীতি গ্রহণ করবে না : স্থানীয় অধিবাসীদের মতামত ছাড়া কোন দেশের রাজ্যসীমা পরিবর্তন করা চলবে না ; প্রত্যেক পরাধীন দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে : ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব দেশের সংগে সমান ব্যবহার করা হবে ; সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য সব দেশ পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করে চলবে ; সব দেশ সমরাস্ত্রের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে শান্তি বজায় রাখতে যত্নশীল হবে—

উইনস্টন চার্চিল

ইত্যাদি। আতলান্তিক সনদ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার ভিত্তি বলা যায়।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মাসে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন ও ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বাক্ষর করেন। সেই বছরের অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঃ উদ্দেশ্য

এই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশ্বশান্তি বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষিমূলক সমস্যার সমাধান করা; জাতি, ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে সব দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা; অনুন্নত দেশের জনগণের উন্নতি সাধনে সাহায্য করা—ইত্যাদি। ছয়টি প্রধান বিভাগ নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থা গঠন করা হয়—যথা সাধারণসভা, স্বস্তি-পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত, অছি-পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ ও দপ্তরখানা।

অনুশীলনী

১। চীনের প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন কিভাবে হয়?

২। সান-ইয়াৎ সেনের তিনটি মৌলিক নীতি কি ছিল?

৩। চীনে ৪ঠা মে-র আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

৪। চীনে কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্টদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর চীনের গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে কি জান?

৭। আতলান্তিক সনদের কথা কারা প্রথম ঘোষণা করেন? এর নীতি কি ছিল?

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? এই সংস্থার উদ্দেশ্য কি?

প্রশ্নমালা

(১) শূন্যস্থান পূরণ কর

প্রথম অধ্যায়

১। ক্রুসেডের পর ইউরোপে নতুন ফসলের চাষ শুরু হয় ; যথা ——।
২। আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সামন্তদের —— ও ——।
৩। রেশমগুটির চাষ শুরু হওয়ায় —— বস্ত্রের উৎপাদন শুরু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ঐতিহাসিকরা বর্তমান ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণকে —— যুগ বলে মনে করেন।
২। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় যাঁদের বলা হত ——।
৩। —— খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের কাছে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।
৪। ফোরেন্স নগরে সংস্কৃতির দুই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন —— ও —।
৫। ইউরোপে যাঁরা নব জাগরণের প্রবর্তন করেন তাঁরা—নামে পরিচিত।
৬। ইটালীর জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা হলেন ——, — ও —।
৭। দান্তে ছিলেন —— নগর রাষ্ট্রের নাগরিক।
৮। দান্তের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ——।
৯। বোকাচ্চিও —— নামে এক গল্পগুচ্ছ রচনা করেন।
১০। মেকিয়াভেলিকে —— জনক বলা যায়।
১১। কেণ্টার বেরী টেলস্-এর রচয়িতা হলেন ——।
১২। 'ম্যাকবেথ' নাটকের রচয়িতা হলেন ——।
১৩। 'মানবতাবাদীদের যুবরাজ' বলা হয় ——।
১৪। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির বিখ্যাত দুটি ছবি হল —— ও ——।

তৃতীয় অধ্যায়

১। 'অ্যাস্টোলেব' যন্ত্রের সাহায্যে —— নির্ণয় করা সহজ হয়।
২। ভাস্কো-দা-গামা —— খ্রীষ্টাব্দে ভারতের — বন্দরে এসে পেঁছান।
৩। —— নাম অনুসারে আতলান্তিক মহাসাগরের ওপারের ভুখণ্ডের নাম হয় ——।
৪। —— নাম অনুসারে আমেরিকার এক সংকীর্ণ প্রণালীর নাম হয় ——।

চতুর্থ অধ্যায়

১। —— কে 'সংস্কারের শুকতারা' বলা হয়।
২। সর্বপ্রথম পোপ ও গির্জার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন ——।
৩। ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম নায়ক ছিলেন ——।
৪। 'ব্যাবিলোনিয়ান' নামক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ——।

৫। ক্যালভিনপন্থীরা ছিলেন —— পন্থী।
৬। —— থেকে —— খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ট্রেণ্ট সভার কাজ চলে।
৭। —— খ্রীষ্টাব্দে অগসবার্গ-র শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীকে বলা হত ——।
২। 'লর্ড প্রোটেক্টর' বলা হত —— কে।
৩। —— খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব ঘটে।
৪। —— খ্রীষ্টাব্দে বিল-অফ-রাইটস্' পাশ করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ——।
২। —— খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়।
৩। —— খ্রীষ্টাব্দে আকবর মাত্র —— বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।
৪। রাজপুত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রাণা ——।
৫। শাহজাহানের চার পুত্র ছিলেন ——, ——, ——, ——।
৬। —— খ্রীষ্টাব্দে —— সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন।
৭। —— খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে বসেন।
৮। —— খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়।
৯। —— খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ ও —— দের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ হয়।
১০। —— 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন ——।
১১। শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ——।
১২। শিখদের ধর্ম গ্রন্থের নাম ——।

সপ্তম অধ্যায়

১। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজদের সেনানায়ক ছিলেন ——।
২। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।
৩। 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির প্রবর্তক ছিলেন লর্ড ——।
৪। —— খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঘটে।
৫। —— খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ঘটে।

অষ্টম অধ্যায়

১। আমেরিকায় ইংরাজদের উপনিবেশের সংখ্যা ছিল ——।
২। —— খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিকদের ওপর স্ট্যাম্প কর ধার্য করা হয়।
৩। —— খ্রীষ্টাব্দের —— জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
৪। —— খ্রীষ্টাব্দে —— ফ্লাইং-শাটল্ আবিষ্কার করেন।
৫। —— খ্রীষ্টাব্দে —— স্পীনিং জেনি আবিষ্কার করেন।
৬। বাষ্প যুগের যথার্থ প্রবর্তক ছিলেন ——।

৭। ফরাসী বিপ্লবের সময় খ্যাতনামা ফরাসী দার্শনিক ছিলেন —, — ও ——।

৮। —— খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস্-জেনারেল আহ্বান করা হয়।

৯। —— খ্রীষ্টাব্দের —— জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে।

১০। —— খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

১১। ওয়াটারলু-র যুদ্ধ হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

নবম অধ্যায়

১। মেটারনিক ছিলেন —— চ্যান্সেলার।

২। ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডী ছিলেন —— দুই খ্যাতনামা বিপ্লবী।

৩। "রাজাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার জনযুদ্ধের পালা"—এই কথা ঘোষণা করেন ——।

৪। বিসমার্ক ছিলেন —— রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

৫। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

৬। — খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

৭। —— খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

৮। —— খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস-এর জন্ম হয়।

৯। কার্ল মার্কস-এর বিখ্যাত ইস্তাহার —— নামে পরিচিত।

দশম অধ্যায়

১। প্রথম চীন যুদ্ধ ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।

২। টিয়েনসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

৩। চীনে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি'র প্রস্তাব করেন ——।

৪। বক্সার বিদ্রোহ ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।

৫। চীনের বিধবা সম্রাজ্ঞীর নাম ছিল ——।

৬। মাঞ্চু বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন ——।

৭। পেরী জাপানে প্রথম আসেন —— খ্রীষ্টাব্দে।

৮। জাপানে পুনঃস্থাপন বিপ্লব ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।

৯। রুশ-জাপানী যুদ্ধ ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।

একাদশ অধ্যায়

১। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন—খ্রীষ্টাব্দে।

২। তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

৩। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন ——।

৪। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন ——।

৫। ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করেন —— খ্রীষ্টাব্দে।

৬। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় —— খ্রীষ্টাব্দে — শহরে।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।
২। জার্মানী যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে — খ্রীষ্টাব্দের — নভেম্বর।
৩। দুইটি হোমরুল আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন — ও —।
৪। লক্ষ্ণৌ-চুক্তি সম্পন্ন হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৫। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ——।
৬। 'বাঘা যতীন' বলা হয় —— কে।
৭। রাওলাট আইন পাশ করা হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৮। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে —— খ্রীষ্টাব্দে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদল —— ও —— নামে পরিচিত ছিল।
২। বলশেভিক দলের নেতা ছিলেন ——।
৩। রাশিয়ার প্রাচীন গণপরিষদ —— নামে পরিচিত ছিল।
৪। রুশ শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট করে —— খ্রীষ্টাব্দে।
৫। রাশিয়ার শেষ জার ছিলেন ——।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। প্যারিসের শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
২। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের 'প্রধান চারজন' ছিলেন ————।
৩। ইটালীর ফ্যাসিবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ——।
৪। জার্মানীর নাৎসীবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন – –।
৫। 'মেইনক্যাম্ফ' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ——।
৬। জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করে —— সেপ্টেম্বর —— খ্রীষ্টাব্দে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

ষোড়শ অধ্যায়

১। ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন ——।
২। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৩। মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান শুরু হয় — ই মার্চ — খ্রীষ্টাব্দে।
৪। গান্ধি-আরউন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৫। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় —— ই আগস্ট —— খ্রীষ্টাব্দে।
৬। 'নেতাজী' বলা হয় —— কে।

সপ্তদশ অধ্যায়

১। চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
২। কুয়ো-মিন-তাং দলের প্রতিষ্ঠা করেন ——।
৩। চীনে ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে ——ঠা মে —— খ্রীষ্টাব্দে।
৪। চীনের কমিউনিস্ট দলের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৫। সিয়াং-ফুতে বন্দী হন ——।
৬। চীনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।
৭। ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগের প্রতিষ্ঠা করেন —— খ্রীষ্টাব্দে।
৮। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে —— খ্রীষ্টাব্দে।
৯। আতলান্তিক সনদ ঘোষণা পত্র প্রচার করেন —— ও ——।
১০। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় —— খ্রীষ্টাব্দে।

(২) শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ দাও

১। তুর্কীদের কাছে কনস্টান্টিনোপল-এর পতন ঘটে—১২৫৩, ১৩৫৩, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।
২। ফ্লোরেন্সের দুই সংস্কারকামী শাসক ছিলেন—পোপ লিও, এ বিলার্ড, কশিমো, সেণ্ট আন সেম, লরেঞ্জো-দা-মেডিসি।
৩। দান্তে ছিলেন— মিলানের নাগরিক, ভেনিসের নাগরিক, ফ্লোরেন্সের নাগরিক।
৪। কেণ্টারবেরী-টেলস্-এর রচনা করেন— ফ্রান্সিস বেকন, এডমণ্ড স্পেনসার, চসার, শেক্সপীয়র।
৫। 'নাবিক হেনরী' বলা হয় ইংল্যাণ্ডের যুবরাজকে, স্পেনের যুবরাজকে, পর্তুগালের যুবরাজকে।
৬। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন : দিয়াজ, ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, কেব্রাল।
৭। ইউরোপে সংস্কারের 'শুকতারা' বলা হয় —মার্টিন লুথারকে, হাস-কে, জন ওয়াইক্লিফকে, পোপ লিও-কে।
৮। ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়—অষ্টম হেনরীর আমলে, প্রথম এলিজাবেথের আমলে, প্রথম চার্লস-এর আমলে।
৯। অগসবার্গ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।
১০। দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন - ইংল্যাণ্ডের রাজা, স্পেনের রাজা, জার্মানীর সম্রাট।
১১। ইংল্যাণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব ঘটে—১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১২। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আকবর, বাবর, ঔরঙ্গজেব।

১৩। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের রচনা করেন—বাদাউনি, আবুল ফজল, জাহাংগীর, ইবন-বতুতা।

১৪। কলকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা করেন—রবার্ট ক্লাইভ, ক্যাপ্টেন হকিন্স, জব চার্নক, টমাস রো।

১৫। তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ঘটে—১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৬। শিখদের প্রথম গুরু ছিলেন—অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, নানক।

১৭। 'খালসা'-সংস্থার প্রবর্তন করেন—নানক, গুরু গোবিন্দ, গুরু অর্জুন গুরু অমরদাস।

১৮। পলাশীর যুদ্ধ হয়—ইংরাজ ও মীরকাশিমের মধ্যে, ইংরাজ ও সিরাজের মধ্যে, ইংরাজ ও আলিবর্দীর মধ্যে।

১৯। 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির প্রবর্তক ছিলেন - লর্ড ক্লাইভ, লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড ডালহৌসী।

২০। মহাবিদ্রোহ ঘটে—১৬৫৭ সালে, ১৭৫৭ সালে, ১৮৫৭ সালে।

২১। আমেরিকা মহাদেশে ইংরাজরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে—১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে।

২২। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

২৩। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের প্রধান নেতা ছিলেন, জেফারসন, ডেভিস, জর্জ ওয়াশিংটন, জেনারেল-লী, কর্ণওয়ালিস।

২৪। 'ফ্লাইং-শাটলের' আবিষ্কারক ছিলেন—আর্করাইট, জন-কে, কার্টরাইট, হারগ্রীভস্।

২৫। ফরাসী বিপ্লব ঘটে—চতুর্দশ-লুই-এর আমলে, পঞ্চদশ-লুই-এর আমলে, ষোড়শ-লুই-এর আমলে, অষ্টাদশ-লুই-এর আমলে।

২৬। নেপোলিয়ন সম্রাট উপাধি ধারণ করেন - ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

২৭। ভিয়েনা সম্মেলন বসে - ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

২৮। 'নবীন ইটালী' দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—কাভুর, ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডী, ভিক্টর ইমানুয়েল।

২৯। আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন : ইংল্যাণ্ডের জন-নায়ক, আমেরিকার জন-নায়ক, জার্মানীর জন-নায়ক।

৩০। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩১। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' রচনা করেন—বিসমার্ক, এঞ্জেলস্, কার্ল-মার্কস, রুশো।

৩২। প্রথম চীন যুদ্ধ হয়—১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৩। চীন সাম্রাজ্যে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি'-র কথা ঘোষণা করেন—আব্রাহাম লিংকন, জন-হে, জেফারসন ডেভিস।

৩৪। বক্সার বিদ্রোহ ঘটে –১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৫। চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়—১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৬। জাপানের বিপ্লব ঘটে—১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৭। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৮। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় –১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৯। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন।

৪০। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ঘটে—১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৪১। রাশিয়ার বলশেভিকদের নেতা ছিলেন—টলস্টয়, কার্ল মার্কস, লেনিন।

৪২। রুশ বিপ্লব ঘটে—১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৪৩। রাশিয়ার মেনশেভিক দলের নেতা ছিলেন—লেনিন, কেরেনস্কি, স্টালিন।

৪৪। 'চোদ্দদফা নীতির' প্রস্তাবক ছিলেন—লয়েড জর্জ, উড্রো-উইলসন, ক্লিমেনশো।

৪৫। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়—অস্ট্রিয়ার সঙ্গে, জাপানের সঙ্গে, জার্মানীর সঙ্গে।

৪৬। জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৪৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৪৮। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় – ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

৪৯। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয়—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৫০। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

৫১। কুয়ো-মিন-তাং দলের প্রতিষ্ঠা করেন—ইউয়ান-শিকাই, সান-ইয়াৎ সেন, চিয়াং কাইশেক।

৫২। সিয়াং-ফু ঘটনা ঘটে—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

৫৩। আতলান্তিক সনদের ঘোষণা করা হয়—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪১ খ্রীষ্টার্দে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

(৩) এক কথায় উত্তর দাও

১। কত সালে কনস্টান্টিনোপল-এর পতন ঘটে ?
২। লরেঞ্জো-দা-মেডিসি কোন্ রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন ?
৩। 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?
৪। ডিভাইন কমেডি-র রচয়িতা কে ?
৫। 'মানবতাবাদীদের যুবরাজ' কাকে বলা হয় ?
৬। 'মোনালিসা'-র চিত্রকর কে ?
৭। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক কে ?
৮। আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কারক কে ?
৯। ওয়াক্লিফ কে ছিলেন ?
১০। ইংল্যান্ডের গোঁড়া প্রোটেস্টান্টদের কি বলা হত ?
১১। অগসবার্গ শান্তিচুক্তি কোন্ সালে স্বাক্ষরিত হয় ?
১২। দ্বিতীয় ফিলিপ কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ?
১৩। ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনী কি নামে পরিচিত ছিল ?
১৪। ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব কোন্ সালে সংঘটিত হয় ?
১৫। হলদিঘাটের যুদ্ধ কোন্ সালে ঘটে ?
১৬। কোন্ মুঘল সম্রাটের উপাধি ছিল আলমগীর ?
১৭। মানুচী কোন্ দেশের লোক ছিলেন ?
১৮। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কোন্ পারস্য সম্রাট ভারত আক্রমণ করেন ?
১৯। কলকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?
২০। প্রথম পেশোয়ার নাম কি ?
২১। কোন্ সালে পানিপথের যুদ্ধ ঘটে ?

২২। খালসার সংগঠন প্রথম কে করেন ?
২৩। টিপু সুলতান কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ? তাঁর পিতার নাম কি ?
২৪। কোন্ সালে ভারতে মহাবিদ্রোহ ঘটে ?
২৫। আমেরিকায় ইংরাজদের কটি উপনিবেশ ছিল ?
২৬। রেড ইণ্ডিয়ান কাদের বলা হয় ?
২৭। 'ওয়াটার ফ্রেম' যন্ত্রের আবিষ্কারক কে ছিলেন ?
২৮। বাষ্প যুগের প্রবর্তক কাকে বলা হয় ?
২৯। ফরাসী বিপ্লব কোন্ সালে আরম্ভ হয় ?
৩০। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন ?
৩১। কোন্ সালে নেপোলিয়ন সম্রাট উপাধি ধারণ করেন ?
৩২। মেটারনিক কে ছিলেন ?
৩৩। বিসমার্ক কে ছিলেন ?
৩৪। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্যোক্তা কাকে বলা হয় ?
৩৫। মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাট কে ছিলেন ?
৩৬। কোন্ সালে চীনের গণবিপ্লব ঘটে ? এই বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন ?
৩৭। কত সালে চীন-জাপান যুদ্ধ ঘটে ?
৩৮। আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা কে নির্দিষ্ট করেন ?
৩৯। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?
৪০। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?
৪১। জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা প্রথম কে করেন ?
৪২। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোন্ শহরে অনুষ্ঠিত হয় ?
৪৩। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ?
৪৪। 'স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার'—কে প্রথম এই কথা ঘোষণা করেন ?
৪৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে আরম্ভ হয় ?
৪৬। রুশ সার্ফদের মুক্তি নির্দেশ কে জারী করেন ?
৪৭। লেনিন কে ছিলেন ?
৪৮। কোন্ সালে জারবংশের পতন ঘটে ?
৪৯। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রধান চার নেতা কে ছিলেন ?
৫০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাইসন্ধি কোন্ দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয় ?
৫১। ইটালীর ফ্যাসিবাদী দলের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?

৫২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন্ সালে শুরু হয় ?

৫৩। ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কে প্রথম শুরু করেন ?

৫৪। কোন্ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ?

৫৫। কোন্ সালে চীনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ?

৫৬। কোন্ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় ?

৫৭। 'তু-চুন'-কাদের বলা হত ?

৫৮। সান-ইয়াৎ সেন কে ছিলেন ?

৫৯। চিয়াং-কাইশেক কোন্ দ্বীপে আশ্রয় নেন ?

৬০। ভিয়েৎনাম স্বাধীনতালীগের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?

(৪) সঠিক উত্তরটির পাশে '√' চিহ্ন দাও ঃ

১। বাঘাযতীন কাকে বলা হয় ?

(i) বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ ☐ (ii) ক্ষুদীরাম বসু ☐ (iii) যতীন মুখোপাধ্যায় ☐

২। 'গদর'দলের প্রতিষ্ঠা কোন সালে হয় ?

(i) ১৯১৫ সালে ☐ (ii) ১৯১৩ সালে ☐ (iii) ১৯১৬ সালে ☐

৩। 'অহিংস-সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের প্রবর্ত্তক কে ?

(i) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ☐ (ii) রাসবিহারী বসু ☐ (iii) মতিলাল নেহেরু ☐

৪। কোন্ সালে 'রাওলাট আইন' জারী করা হয় ?

(i) ১৯১৯ সালে ☐ (ii) ১৯২১ সালে ☐ (iii) ১৯২৪ সালে ☐

৫। কোন্ সালে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' হত্যাকাণ্ড ঘটে ?

(i) ১৯১৫ সালে ☐ (ii) ১৯১৮ সালে ☐ (iii) ১৯১৯ সালে ☐

৬। 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' হত্যাকাণ্ডের আদেশ কে দিয়েছিলেন ?

(i) চার্লস টেগার্ট ☐ (ii) ও-ডায়ার ☐ (iii) মাউণ্ট-ব্যাটেন ☐

৭। কোন সালে 'খিলাফত' আন্দোলন শুরু হয় ?

(i) ১৯১৭ সালে ☐ (ii) ১৯১৮ সালে ☐ (iii) ১৯১৯ সালে ☐

৮। 'সৌকত আলি' কে ছিলেন ?

(i) কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ☐ (ii) খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা ☐

৯। কোন্ সালে 'মণফোর্ড আইন' পাশ করা হয় ?

(i) ১৯১৯ সালে ☐ (ii) ১৯২০ সালে (iii) ১৯২১ সালে ☐

১০। কোন্ সালে 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয় ?

(i) ১৯০৭ সালে ☐ (ii) ১৯২১ সালে ☐ (iii) ১৯৪৭ সালে ☐

১১। কোন্ সালে 'সর্বভারতীয় কিষাণ-সভার' প্রতিষ্ঠা হয় ?

(i) ১৯৩৬ সালে ☐ (ii) ১৯৩৭ সালে ☐ (iii) ১৯৩৮ সালে ☐

১২। 'লবণ আইন' অমান্য প্রথম কে করেন ?

(i) জহরলাল নেহেরু ☐ (ii) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ☐

(iii) মহাত্মাগান্ধী ☐

১৩। 'খোদা-ই-খিদমৎগার' দলের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(i) খান আব্দুল গফুর খান ☐ (ii) মুজফ্ফর আহমেদ ☐

১৪। 'সীমান্ত গান্ধী'-কাকে বলা হয় ?

(i) মহাত্মা গান্ধীকে ☐ (ii) খান আব্দুল গফুর খান কে ☐

১৫। ইংরাজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব প্রথমে কে দেন ?

(i) মহাত্মাগান্ধী ☐ (ii) জহরলাল নেহেরু ☐

১৬। 'নেতাজী'-কাকে বলা হয় ?

(i) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে ☐ (ii) সুভাষ চন্দ্র বসুকে ☐

(iii) জহরলাল নেহেরুকে ☐

১৭। কত সালে 'ভারতীয় নৌ-বাহিনী' বিদ্রোহ করে ?

(i) ১৯৪৫ সালে ☐ (ii) ১৯৪৬ সালে ☐ (iii) ১৯৪৭ সালে ☐

১৮। 'ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের' ভারতে আসার সময় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী কে ছিলেন ?

(i) চেম্বার লেন ☐ (ii) এটলী ☐ (iii) চার্চিল ☐

১৯। ভারতের শেষ ব্রিটিশ 'ভাইসরয়' কে ছিলেন ?

(i) স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপস☐ (ii) লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ☐

২০। কোন্ সালে ভারতকে 'এক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয় ?

(i) ১৯৪৭ সালে ☐ (ii) ১৯৫০ সালে ☐

২১। 'কুয়ো মিং তাং' দলের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?

(i) ইউয়ান-শি-কাই ☐ (ii) সান্ ইয়াৎ-সেন ☐

২২। কোন্ সালে চীনা কমিউনিস্ট দলের প্রথম কংগ্রেসের বৈঠক বসে ?

(i) ১৯২১ সালে ☐ (ii) ১৯২৫ সালে ☐ (iii) ১৯৪৯ সালে ☐

২৩। চীনা কমিউনিষ্ঠ-দলের প্রধান নেতা কে ছিলেন ?

(i) মাও-সে-তুং ☐ (ii) চিয়াং কাইশেক ☐

২৪। কোন্ সালে 'চীনা কমিউনিস্টদের লং-মার্চ' উৎযাপিত হয় ?

(i) ১৯৩৪ সালে ☐ (ii) ১৯৩৫ সালে ☐ (iii) ১৯৩৬ সালে ☐

২৫। কোন্ সালে চীনে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা হয় ?

(i) ১৯৪৯ সালে ☐ (ii) ১৯৫০ সালে ☐

২৬। ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগের প্রতিষ্ঠা কে করেন ?

(i) হোচিমিন্ ☐ (ii) ডক্টর সুকর্ণ ☐

২৭। কোন্ সালে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ?

(i) ১৯৪৭ সালে ☐ (ii) ১৯৪৮ সালে ☐ (iii) ১৯৪৯ সালে ☐

২৮। কোন্ সালে 'আটলান্টিক সনদ' নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয় ?

(i) ১৯৪০ সালে ☐ (ii) ১৯৪১ সালে ☐ (iii) ১৯৪২ সালে ☐

মুদ্রণ :
ট্রায়ো প্রসেস
কলিকাতা- ১৪